স্বর্ণ গুহা
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

স্বর্ণগুহা-৮০

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ আগস্ট ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

দরজা খুলে যেতেই ভিতরে দৃষ্টি পড়লো দিপালীর। বিস্ময়ে চমকে উঠলো সে—রাশি রাশি স্বর্ণ মোহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি জীবন্ত কঙ্কাল।

ফিরে তাকালো বনহুর দিপালীর মুখের দিকে।

দিপালীর দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে—এ যেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। মানুষ নয়, এ যেন এক চামড়া আচ্ছাদিত কঙ্কাল। চোখ বসে গেছে চার আংগুল। চুল রুক্ষ, লম্বা এলোমেলো। জামাকাপড় ক্ষুধার জ্বালায় দাঁত দিয়ে টেনে কাঁমড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। চেহারা দেখলে চিনবার কোনো উপায় নেই—কে এই ব্যক্তি।

বনহুর বললো—দিপালী, কিছু পূর্বে সুড়ঙ্গপথে আসার সময় তুমি যে কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলো তা এই এরই গলার আওয়াজ।

দিপালী বললো—তুমি না বললে এ আওয়াজ কোনো জানোয়ারের কণ্ঠের?

হাঁ, জানোয়ারেরই বটে। এই যে জীবন্ত কঙ্কাল দেখছো এটা জানোয়ারই, কারণ মানুষ কোনোদিন মানুষের রক্ত শুষে খায় না।

দিপালী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—এই লোকটা বুঝি মানুষের রক্ত শুষে খেতো?

হাঁ দিপালী। দাঁতে দাঁত পিষে বলতে লাগলো বনহুর—মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। এই ব্যক্তি হলো কান্দাই রিলিফ প্রধান। বিদেশ থেকে যে হাজার হাজার মণ চাল, গম এবং শিশুখাদ্য এসেছে তা এই নরপশু সীমান্তের ওপারে পাচার করে দিয়েছে। দেশের মানুষ না খেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় তিল তিল করে মরেছে অথচ ঐশ্বর্যের ইমারতে বসে বেহেশ্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছে। তাই—তাই আমি এই নরপশুকে স্বর্ণগুহায় আটক করে রেখেছি যতগুলি স্বর্ণ ভক্ষণে উদর পূর্ণ করুক।

রিলিফ প্রধান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছিলেন, তিনি করুণ ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠেন—আমার...অপরাধ..মাফ...করে...দাও...আমি...শপথ...ক..র..ছি।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর—শপথ করছি! কিসের শপথ?

আর...কোনো...দিন...

সেদিন আর তোমার ভাগ্যে ফিরে আসবে না শয়তান। এই স্বর্ণগুহাই হবে তোমার সমাধি কক্ষ, মনে রেখো রিলিফ প্রধান।

তুমি...তুমি......

হাঁ, আমি বড় নিষ্ঠুর। তোমাদের মত জীবন্ত শয়তানগুলোকে এমনি করেই স্বর্ণগুহায় আটক করে যত খুশি স্বর্ণ ভক্ষণে সুযোগ দেই। বনহুরের কথা শেষ হতে না হতেই স্বর্ণগুহার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

ভিতর থেকে কোনো আওয়াজ আর শোনা যায় না।

দিপালী বলে উঠে—রাজকুমার, ঐ হতভাগ্যটিকে ক্ষমা করে দাও।

ক্ষমা। ওদের জন্য আমার কাছে ক্ষমা নেই দিপালী। যদি কেউ চুরি করে, ডাকাতি করে কিংবা খুন করে তবু ক্ষমা করতে পারি কিন্তু যারা মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে খায় তাদের আমি ক্ষমা করি না। চলো দিপালী।

বনহুর এগুতে লাগলো।

দিপালী ওকে অনুসরণ করলো।

কিছুটা এগিয়ে বললো দিপালী—এত দূর থেকে কি করে ওর কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পেয়েছিলাম?

ঐ সুড়ঙ্গমধ্যে স্বর্ণগুহার সঙ্গে একটি শব্দযন্ত্রের যোগাযোগ আছে, তাই স্বর্ণগুহায় সামান্য শব্দ হলেও তা ঐ সুড়ঙ্গ মধ্যে স্পষ্ট শোনা যায়।

ও এবার বুঝতে পেরেছি, এজন্যই আমরা সুড়ঙ্গমধ্যে বহুদূরে থেকেও ঐ রিলিফ প্রধানের কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম।

হাঁ দিপালী।

কিন্তু লোকটার শেষ পরিণতি কি ঐ স্বর্ণগুহায়......

হাঁ, তার শেষ সমাধি রচনা হবে। দিপালী, আমি সব শ্রেণীর লোকদের ক্ষমা করবো কিন্তু যারা দেশবাসীর মুখের আহার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাদের ক্ষমা করবো না। আমার মনে হয় আল্লাহও তাদের ক্ষমা করবেন না কোনোদিন। দিপালী, দেশের এই মহা ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্য শুধু এরাই দায়ী।

দিপালী বললো—শুনেছি সরকার নাকি এবার থেকে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন?

হাঁ, আমিও সেই রকম শুনেছিলাম এবং শুনছি—কি সে ব্যবস্থা, সত্যিই কার্যকরী হবে কিনা বলা মুস্কিল। আর যদি হয় তবু দেখবে সত্যিকারের যারা অপরাধী তাদের বিচার হবে না। যারা গদিতে বসে কোটি কোটি মূল্যের খাদ্যসম্ভার দেশের বাইরে পাচার করছে বা পাচারে সহায়তা করছে তারা চিরকাল তেমনি করে যাবে। আর দুষ্কৃতি হিসেবে যাদের শাস্তি দেওয়া হবে তারা হলো ছা-পোষা চোরাকারবারী।

ছা পোষা চোরাকারবারী কেমন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

যারা পাঁচ দশ-টাকার মাল নিয়ে সীমান্তের ওপারে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় তারাই হলো ছা-পোষা চোরা কারবারী। সরকারপক্ষের লোক এইসব ছা-পোষা চোরাকারবারীদের গ্রেপ্তার করে পত্রিকায় ফলাও করে সংবাদ প্রকাশ করেন চোরাচালানী গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইতো হলো সরকারের দুষ্কৃতি দমনে বাহাদুরি......

তাহলে এবারও কি সরকার এমনিভাবে দেশ ও দশকে মিথ্যার বাণী শুনিয়ে শান্ত রাখবেন?

সরকার তুমি কাকে বলছো দিপালী?

ঐ তো যারা ঘোষণা করেছেন এবার থেকে অন্যায় অনাচার যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

বনহুর হেসে উঠলো, তারপর বললো—এ ব্যবস্থা যেদিন সত্যিকারের কাজে আসবে সেদিন তুমি এ প্রশ্ন আমাকে করো দিপালী। আজ আর নয়......বনহুর সম্মুখে একটি লিফট দেখিয়ে বললো—তুমি ঐ লিফটে উঠে দাঁড়াও, তোমার কক্ষে পৌঁছে দেবে।

আর তুমি! রাজকুমার, তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?

আমার কাজ আছে।

আবার তবে কবে দেখা হবে?

যখন সময় পাবো।

রাজকুমার অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

বেশ তো, যেদিন আসবো সেদিন শুনবো তোমার সব কথা। যাও দিপালী।

দিপালীর হাত ধরে বনহুর ওকে তুলে দেয় লিফটে। একটা সুইচে চাপ দিতেই লিফটাখানা সাঁ সাঁ করে উঠে যায় উপরে।

বনহুর ফিরে দাঁড়ায়।

ফিরে তাকিয়েই দেখতে পায় তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মোহসিন, হাতে তার সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

বনহুর ফিরে তাকাতেই মোহসিন ছোরাখানা বনহুরের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে উঠে—সর্দার, আমি বড় অপরাধী, আমাকে আপনি এই ছোরা দ্বারা হত্যা করুন। আমাকে আপনি হত্যা করুন সর্দার......

বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে— তুমি একি বলছো মোহসিন?

সর্দার, আমি বড় অপরাধী। আমার অপরাধের ক্ষমা নেই। সর্দার, আমি আপনাকে হত্যা করবার অভিপ্রায়ে এসেছিলাম......

মোহসিন!

হাঁ সর্দার। আপনি আমাকে হত্যা করুন। সর্দার, দিপালীর প্রতি আমার দুর্বলতা আছে এবং সেই কারণে তাকে আমি অনুসরণ করেছিলাম। সর্দার মনে করেছিলাম আপনার সঙ্গে তার......না না, ও কথা আমি উচ্চারণ করতে পারবো না। আমাকে আপনি হত্যা করুন, নাহলে আমার পাপের শাস্তি হবে না। সর্দার আপনি আমাকে হত্যা করুন......

ঠিক ঐ মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হলো রহমান। কুর্ণিশ জানালো সে সর্দারকে, তারপর বললো—কি হয়েছে সর্দার বলুন?

বনহুর রহমানকে ঐ মুহূর্তে দেখে অবাক হয়ে গেছে। সেই দন্ডে বনহুর নিজকে সামলে নিয়ে বলে—মোহসিন আমাকে রক্ষা করেছে রহমান। এই ছোরাখানা আমার অজ্ঞাতে কেউ আমাকে হত্যার কারণে নিক্ষেপ করেছিলো।

সর্দার! অস্ফুট শব্দ করে উঠে রহমান।

বনহুর বলে—মোহসিন ঐ সময় না এসে পড়লে হয়তো মৃত্যু ঘটা অস্বাভাবিক ছিলো না। এই নাও মোহসিন, ছোরাখানা তুমিই রেখে দাও।

মোহসিন নত মস্তকে ছোরাখানা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো।

বনহুর আর রহমান চলে গেলো বিপরীত পথে।

❑

আস্তানার বাইরে আধো অন্ধকার অপেক্ষা করছিলো তাজ। বনহুর বেরিয়ে আসতেই তাজ শব্দ করে উঠলো চিঁহিঁ চিঁহিঁ।

বনহুর ওর পাশে এসে দাঁড়ালো, পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো—দাঁড়া যাচ্ছি।

তাজ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সম্মুখের পা দু'খানা উঁচু করে ধরলো, তারপর চেপে বসলো তাজের পিঠে।

তাজের জমকালো দেহের সঙ্গে বনহুরের জমকালো পোশাক যেন মিশে গেলো একেবারে। লাগাম ধরতেই ছুটতে শুরু করলো।

নিকষ অন্ধকারে তাজের খুরের প্রতিধ্বনি জাগলো।

অতি পরিচিত সেই শব্দ।

কান্দাইয়ের মানুষের কানে এ শব্দ নতুন নয়। এ শব্দ শোনামাত্র অনেকেই শিউরে উঠলো, আবার অনেকের মনে খুশির উচ্ছ্বাস বয়ে গেলো।

পুলিশ মহলের সবাই সজাগ হয়ে উঠলো।

মিঃ জাফরীর মুহুর্মুহু ফোন আসতে লাগলো। দস্যু বনহুরের আগমন সংবাদ কান্দাই শহরে প্রতিটি পুলিশ মহলকে সজাগ করে তুললো।

মনিরা শুয়েছিলো। হঠাৎ তার শিয়রে ফোন বেজে উঠলো। রিসিভার হাতে তুলে নিলো মনিরা। ওপাশ থেকে ভেসে এলো নারীকণ্ঠ......আমি রীনা বলছি, মনিরা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম, জানতে পারলাম দস্যু বনহুর কান্দাই শহরে এসেছে......

মনিরা অর্ধশায়িত অবস্থায় রিসিভার তুলে নিয়েছিলো হাতে, এবার সে সজাগ হয়ে সোজা হয়ে বসলো, বললো—হ্যালো, দস্যু বনহুর কান্দাই শহরে এসেছে......রীনা...কে বললো তোকে এ কথা?

জবাব এলো রীনা বলছে......আমার শ্বশুর পুলিশ অফিসার......তাঁর কাছেই পুলিশ অফিস থেকে ফোনে সংবাদ এসেছে......তাই মনিরা......আমি বড় দুশ্চিন্তায় আছি।

হেসে বললো মনিরা......দুশ্চিন্তার কারণ আমি বুঝতে পারছি না......দস্যু বনহুর কান্দাই শহরে এসেছে তাতে তোর ক্ষতি কি বলতো......

......তুই বুঝবি না মনিরা, আমার শ্বশুর দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবেন বলে মিঃ জাফরীর সঙ্গে যোগ দিয়ে উঠে পড়ে লেগে গেছেন। আমি জানি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ বলে তাঁরা মনে করেন তত সহজ নয়......

......কিন্তু এতে তোর এত ভীতি কেন শুনি?...

......দস্যু বনহুর সম্বন্ধে যদি ভালভাবে জানতিস মনিরা তবে এ কথা বলতে পারতিস না......

......অবশ্য সে কথা সত্য দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না...

......সেজন্যই বলছিস মনিরা ভীতি কেন......দস্যু বনহুরের আগমন সংবাদে সমস্ত কান্দাই শহরে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে......পুলিশ মহলে মহা হুলস্থুল পড়ে গেছে—

......কিন্তু আমি কিছু জানি না......যাক, এত ভয় পাবার কিছুতেই......দস্যু বনহুর সে তো মানুষ, কাজেই...আচ্ছা রাখি, খোদা হাফেজ!

রিসিভার রেখে ফিরে তাকাতেই দেখতে পায় পিছনে দাঁড়িয়ে নূর। নূর বলে উঠে—আম্মি, দস্যু বনহুর মানুষ, কাজেই কোনো ভয় নেই বলতে পারলো না?

হাঁ বাবা, দস্যু হলেও সে তো মানুষ—বাঘ-ভাল্লুক বা সিংহ নয় যে তাকে এত ভয় করে চলতে হবে।

আম্মি, তুমি আজও দস্যু বনহুর সম্বন্ধে ভালভাবে জানো না তাই অমন কথা বলছো। দস্যু বনহুর সিংহের চেয়েও ভয়ঙ্কর, এ কথা তুমি কোনো সময় ভুলে যেও না। সমস্ত কান্দাই শহরে দস্যু বনহুর এক ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি

করেছে। দস্যু বনহুর নাম শুনলে মানুষ শিউরে উঠে, মানুষের চোখের ঘুম হারিয়ে যায়।

মনিরা পুত্রের কথাগুলো শুনে যায় শুধু, কোনো কথা সে বলে না।

নূর বলে—আম্মি, দরজা ভালভাবে বন্ধ করে শোবে, বলা যায় না শয়তানটার আবির্ভাব কখন কোথায় ঘটবে কে জানে।

মনিরা বললো—নূর, তোকে ভাবতে হবে না বাপ্, তুই শুবি যা।

আচ্ছা আম্মি, আমি যাচ্ছি। নূর চলে যায়।

মনিরা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। অনাবিল এক আনন্দে ভরে উঠেছে মনিরার মন। তার স্বামী কতদিন কান্দাই ছিলো না, ফিরে এসেছে সে কান্দাই শহরে। নিশ্চয়ই সে আসবে। তার মন বলছে নিশ্চয়ই সে আসবে।

কতক্ষণ ভাবে মনিরা, তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। কখন যে ভোর হয়ে গেছে খেয়াল নেই। ভোরে জেগে উঠে মনটা তার বড় ব্যথাকাতর হয়ে উঠে। কই, সমস্ত রাত কেটে গেছে তবু এলো না তো সে। মনিরার মনে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে।

এমন সময় নূর দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে—আম্মি আম্মি উঠো, অনেক বেলা হয়েছে।

মনিরা বুঝতে পারে, তাই তো এতক্ষণও সে শয্যা ত্যাগ করেনি বা দরজা খোলেনি।

আজকাল মনিরা মাঝের দরজা বন্ধ করেই ঘুমায়।

ওপাশের ঘরে শোয় মরিয়ম বেগম। কিছুদিন পূর্বেও নূর দাদীর ঘরেই ঘুমাতো, এখন সে মায়ের ঘরের পাশেই যে ঘর সেই ঘরে ঘুমায়। বয়স তার বেশি না হলেও পড়া শোনায় সে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। স্কুলের শিক্ষক মহল তাকে ভালবাসেন এবং তার উপর ভরসা রাখেন।

নূর বোঝে তাকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে। তাই সে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে। সরকার সাহেব ব্যবস্থা করেছেন আগামীতে তাকে বিদেশ পাঠাবেন।

নূরকে বিদেশ পাঠানো ব্যাপারে মরিয়ম বেগম বা মনিরার কোনো অমত নেই বরং তারা এ ব্যাপারে উৎসাহী।

কিন্তু স্বামী না এলে কিছুতেই মনিরা সন্তানকে বিদেশ পাঠাতে পারছে না। নূরকে বিদেশ পাঠানো ব্যাপারে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন শুধু সঠিক দিন-তারিখ ধার্য করা।

দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই নূর হাস্যোদ্দীপ্ত, মুখে বলে উঠলো—আম্মি এই দেখো আব্বা চিঠি দিয়েছেন। আব্বার ঠিকানাও লিখা আছে এতে। তিনি সরকার সাহেবকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

দেখি দেখি......হাত বাড়িয়ে মনিরা নূরের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে। হাতের লিখা দেখেই মনিরা চিনতে পারলো তার স্বামীর হাতের লিখা চিঠি। চিঠিখানা লিখেছে সে সরকার সাহেবকে। মনিরা পড়তে লাগলো—

"সরকার সাহেব, ছালাম রইলো।
হীরাঝিলের দক্ষিণ ধারে ইরামতি
ঘাটে আমার বজরা অপেক্ষা করবে,
আপনি নূর ও মনিরাকে নিয়ে চলে
আসবেন। আমি বজরায়
আপনাদের প্রতীক্ষায় থাকবো।
—মনির

মনিরা চিঠি পড়া শেষ করে বললো—এ চিঠি তোকে কে দিয়েছে নূর?

সরকার সাহেব দিয়েছেন। তিনি চিঠিখানা দিয়ে বললেন—মাকে গিয়ে বলো তৈরি হতে। আজ দুপুরের পর পরই আমরা রওয়ানা দেবো। আম্মি, তুমি শীঘ্র তৈরি হয়ে নাও, কত দিন হলো আব্বাকে দেখি না।

কিন্তু.........

কোনো কিন্তু নয় আম্মি, আব্বা চিঠি লিখেছেন যেতেই হবে। আমি যাই দাদী আম্মাকে বলিগে।

নূর চলে যায়।

মনিরার ললাটে ফুটে উঠে গভীর চিন্তারেখা। হঠাৎ সে কেন এভাবে চিঠি লিখলো হীরাঝিলের দক্ষিণে ইরামতি ঘাটে তার বজরা থাকবে। সব যেন কেমন ঘোলাটে লাগছে তার কাছে।

মনিরা চিঠিখানা বারবার পড়ছে। না, কোনো সন্দেহের কারণ নেই। এ লেখা তার অতি পরিচিত। তার স্বামীর হাতের লিখা চিঠি। মনিরা এগিয়ে গেলো শাশুড়ির কক্ষ অভিমুখে।

মরিয়ম বেগম নামাজান্তে কোরআন তেলাওয়াৎ করছিলেন। মনিরাকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই কোনো কারণে সে এ সময় তার কক্ষে এসেছে। তিনি কোরআন তেলাওয়াৎ শেষ করে মোনাজাত করলেন তারপর কোরআন শরীফে বারকয়েক চুমু খেয়ে তুলে রাখলেন।

মনিরা তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

শ্বাশুড়ীকে কোরআন শরীফ তুলে রেখে ফিরে তাকাতে দেখে বললো— মামীমা, আপনার ছেলে চিঠি দিয়েছে।

কে মনির চিঠি দিয়েছে?

হাঁ মাসীমা, এই দেখো! মনিরা চিঠিখানা মরিয়ম বেগমের হাতে দেয়.

মরিয়ম বেগম চিঠি পড়া শেষ করে বললেন—হয়তো পুলিশ বাড়ির উপর কড়া নজর রেখেছে তাই সে এই চিঠি দিয়ে যেতে বলেছে তোমাদের।

কিন্তু হঠাৎ এভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে মামীমা?

একটু হেসে বললেন মরিয়ম বেগম—পাগল মেয়ে! স্বামী চিঠি দিয়েছে যাবে না তো কি। বাছা আমার কতদিন আসতে পারেনি......একটু থেমে বললেন তিনি—বিলম্ব না করে তৈরি হয়ে নাও এবং যত শীঘ্র পারো সরকার সাহেব আর নূরকে নিয়ে চলে যাও। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলে দাও বৌমা।

মনিরা কোনো কথা না বলে চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে বেরিয়ে আসে। সম্মুখেই সরকার সাহেবকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

সরকার সাহেব বললেন—কি হলো বৌমা, যাবে তো?

মনিরা বললো—সরকার চাচা, আপনি কি মনে করেন?

মনির যেখানে লিখেছে সেখানে আমি অমত করতে পারি না।

এমন সময় এসে নূর দাঁড়ায়। চোখেমুখে তার আনন্দোচ্ছ্বাস, বলে সে—সরকার দাদা, আমি যাবোই, আব্বু আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে আর...... না না, কারও মানা শুনবো না। আম্মি তুমি যাও চটপট তৈরি হয়ে নাওগে, আমি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলছি।

নূর ছুটে চলে যায়।

সরকার সাহেব বললেন—যাও বৌমা, যাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও।

সরকার সাহেবের কথায় মনিরা কোন জবাব না দিয়ে চলে যায়। নিজের ঘরে প্রবেশ করে আলমারী খুলে বের করে একটা ফটো, যে ফটোখানাকে সে অতি যত্ন সহকারে তুলে রেখেছিলো তার শাড়ির ভাঁজের অন্তরালে।

ফটোখানা তার স্বামীর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনিরা ফটোখানা তুলে ধরলো চোখের সামনে, তারপর চাপাকণ্ঠে বললো—ওগো, সত্যি তুমি ইরামতির ঘাটে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে? এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। কতদিন তোমায় দেখিনি.........

নূর জামাকাপড় পরে এসে দাঁড়ায়—কই, আম্মি তোমার হলো?

এইতো সব গুছিয়ে নিচ্ছি।

নূর চলে যায় সরকার সাহেবের সন্ধানে। ওর মনে আনন্দের উচ্ছাস, কতদিন পর আব্বাকে দেখতে পাবে সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সরকার সাহেব নূর এবং মনিরাসহ গাড়িতে উঠে বসেন। গাড়ি বেরিয়ে এলো চৌধুরীবাড়ির ফটক পেরিয়ে।

জনমুখর রাজপথ বেরে গাড়ি দ্রুত এগুতে থাকে। মনিরার মনে খুশির উচ্ছাস, কিন্তু মুখে সে কোনো কিছু বলছে না—নীরবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। নূর বারবার সরকার সাহেবকে প্রশ্ন করছে, আর কতদূর সরকার দাদা, বলো আর কতদূর সেই হীরাঝিল— কোথায় সেই ইরামতি ঘাট?

সরকার সাহেব হেসে বলেলেন—এইতো প্রায় এসে গেছি দাদু, আর বেশিক্ষণ গাড়িতে থাকতে হবে না।

নূর বললো—সকালে গাড়িতে চেপেছি আর এখন সন্ধ্যা হয় তবু হীরাঝিল পেলাম না। সরকার দাদু, আব্বাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে।

সত্যি দাদু, আমারও বড় দেখতে ইচ্ছা করছে, কতদিন ওকে দেখি না। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন সরকার সাহেব।

মনিরা চুপচাপ বসে বসে শুনছিলো, তার দৃষ্টি ছিলো গাড়ির বাইরে। মনের পর্দায় ভাসছিলো কত স্মৃতি, কত কথা। নূর যখন মাত্র ক'মাসের তখন সন্ন্যাসীরা নূরকে চুরি করে নিয়ে যায়। নূরের জন্য মনিরা পাগলিনীপ্রায় হয়ে উঠেছিলো। দিনরাত শুধু নূরকে নিয়ে ভাবতো মনিরা। স্ত্রীকে বিষণ্নমনা দেখে বনহুর খুব ব্যথা পেতো, নূরের সন্ধানে সে নিজেও আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ফেলেছিলো। এমন দিনে মনিরা জানতে পারে, হীরাঝিলে তার নূরকে কাপালিক সন্ন্যাসীরা আটক করে রেখেছে। কথাটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মনিরা স্বামীকে ধরে বসেছিলো, হীরাঝিলে তার পুত্র আছে। নূরকে যেমন করে হোক এনে দিতেই হবে। বনহুর মনিরার জেদে নিজকে স্থির রাখতে পারেনি। মনিরা সহ গিয়েছিলো হীরাঝিলে কিন্তু মনিরা তখন জানতো না এটা এক ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। নূরকে হীরাঝিলে পাওয়া যাবে বলে বনহুরকে গ্রেপ্তার করার এক বিরাট ব্যবস্থা করা হয়েছিলো সেখানে। তারপর হীরাঝিলে গিয়েছিলো মনিরা স্বামী সহ কিন্তু নূরকে সেখানে পায়নি। ডিটেকটিভ পুলিশ মহল কৌশলে বনহুরকে বন্দী করেছিলো। কথাটা আজ নতুন করে মনে হতেই শিউরে উঠলো মনিরা, আজ আবার তারা সেই হীরাঝিলে চলেছে। জানে না কি পরিণতি আছে তাদের ভাগ্যে। সেই হীরাঝিল যেখানে সে একবার হারিয়েছিলো তার জীবনের পরম সম্পদ স্বামীকে......

হঠাৎ নূরের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে পায় মনিরা। নূর বলছে—দাদু, ঐ বুঝি হীরাঝিল দেখা যাচ্ছে?

সরকার সাহেব বললেন—হাঁ দাদু, ঐ হীরাঝিল দেখা যাচ্ছে। আর বেশি দেরী হবে না, আমরা পৌঁছে যাবো হীরাঝিলে।

নূরের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে আনন্দোচ্ছ্বাস। সে খুশিতে যেন ডগমগ।

হীরাঝিলে পৌঁছতে আর বেশি বিলম্ব হলো না। গাড়ি এসে থামলো হীরাঝিলের অদূরে।

সরকার সাহেব প্রথমে নামলেন। তিনি গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললেন—এসো বৌমা, নেমে এসো।

মনিরা এবং নূর নৈম পড়লো।

হীরাঝিল।

সেই হীরাঝিল, যে হীরাঝিলে মনিরা একদিন আকুল স্বরে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিলো।

মনিরা নূরের হাত ধরে এগুতে লাগলো।

সরকার সাহেব চললেন আগে আগে।

হীরাঝিলের সোপান অতিক্রম করে ওপাশে প্রশস্ত বারান্দা। সবাই মিলে এগিয়ে যায় হীরাঝিলের দক্ষিণে ইরামতি ঘাটের দিকে।

প্রায় ঘন্টাকাল চলার পর তারা ইরামতি ঘাটে পৌঁছে যায়। সত্যিই অদূরে বজরা অপেক্ষা করছে। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠে মনিরার হৃদয়।

নূরের খুশি যেন ধরছে না।

সরকার সাহেবকেও আনন্দোদ্দীপ্ত মনে হচ্ছে।

বজরার নিকটবর্তী হতেই মনিরা, নূর, এবং সরকার সাহেব দেখলেন বজরার রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের আকাঙ্খিত জন। দূর থেকে নজরে পড়তেই নেমে এলো বনহুর বজরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে।

ততক্ষণে মনিরা, নূর ও সরকার সাহেব পৌঁছে গেছে বজরার কাছে।

নূর অস্ফুট কণ্ঠে আনন্দধ্বনি করে উঠে—আব্বা!

বনহুর নূরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠে—কেমন আছো নূর?

আব্বা, তুমি কতদিন যাওনা আমাদের কি ভাল লাগে। এবার তোমাকে যেতেই হবে। দাদী বলেছেন তোমাকে নিয়ে যেতে।

আচ্ছা যাবো।

তারপর তাকায় বনহুর সরকার সাহেবের দিকে, বলে—কেমন আছেন সরকার চাচা?

ভাল আছি বাবা, তুমি কেমন আছো?

দেখতেই পাচ্ছেন। কথার ফাঁকে তাকায় বনহুর মনিরার দিকে—ভাল আছো মনিরা?

আছি। ছোট্ট জবাব দেয় মনিরা।

বনহুর সবাইকে সঙ্গে করে উঠে যায় বজরায়।

সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকার তখন ঘন হয়ে এসেছে। ওদিকে পূর্বাকাশ উজ্জ্বল করে উঁকি দেয় পূর্ণিমার চাঁদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে পৃথিবীর বুক ঝলমল করে উঠে।

বজরার অভ্যন্তরে এসে বসে ওরা ক'জনা। বিরাট প্রশস্ত কক্ষ। মেঝেতে মূল্যব'ন কার্পেট বিছানো। দেয়ালে মূল্যবান তৈলচিত্র টাঙ্গানো আছে। ছাদের সঙ্গে বেলোয়াড়ী ঝাড় ঝুলছে। ঝাড়ের সঙ্গে দুল্‌ছে একরাশ মোমবাতি।

মোমবাতির আলোতে বজরার কক্ষ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কক্ষের মেঝেতে কয়েকটি সোফা গোলাকারভাবে সাজানো। সেই সোফায় গা এলিয়ে দিলো সবাই।

নূর পিতার কোলের কাছ ঘেঁষে বসেছে। সে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখছে তার আব্বাকে। কতদিন হলো তার আব্বাকে সে দেখেনি।

বললো বনহুর—সরকার চাচা, আমি জানি আপনারা না এসে পারবেন না। নূরকে কতদিন দেখিনি! নূরের বিদেশ যাওয়া ব্যাপারে আপনি যে চিঠি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, পেয়েছি। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

বেশ বলো, তোমার কথা শুনতেই এসেছি। বললেন সরকার সাহেব।

বনহুর তখন কথা না বলে পরে বলবে বলে জানালো।

আকাশে চাঁদ হাসছে।

বনহুর নূর সহ বজরার ছাদে এসে বসলো।

সরকার সাহেব আর মনিরা বজরার মধ্যে বিশ্রামের আয়োজন করছেন।

নূর বললো—আব্বা, তুমি কতদিন হলো বাড়ি যাওনা, কেন বলো তো?

তোমার বুঝি বড্ড খারাপ লাগে?

হাঁ আব্বা, আমার বড্ড খারাপ লাগে। তুমি কোথায় কি চাকরি করো কোনোদিন বললেনা?

বলবো! এবার বলবো বলেই তোমাদের ডেকেছি নূর।

সত্যি বলবে?

হাঁ।

কিন্তু এতদিন কেন বলোনি? আব্বা, আম্মিকেও তুমি বলোনা। কতদিন আম্মিকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি তিনি বলেন আমি জানি না। আব্বা, আজ তোমাকে বলতেই হবে তুমি কোথায় কি কাজ করো।

বেশ বলবো।

শুধু বলবো নয়, আমরা যাবো সেখানে, কোথায় তুমি কাজ করো দেখবো।

বনহুর বিব্রত বোধ করে, কারণ জানে সে নূর বড় জেদী ছেলে হয়েছে। বয়স তার তত পাকা নয় বুদ্ধি তার বড় পাকা। কথাবার্তায় সে বয়সী ব্যক্তিদের হার মানায়। বনহুর নূরের কাছে অপরাধীর মত বললো—আচ্ছা।

আব্বা!

বলো?

এ বজরাখানা বুঝি তোমাদের মালিকের?

হাঁ।

খুব বুঝি ধনবান তোমাদের মালিক?

হাঁ।

আব্বা, আমাদের তো কোনো অভাব নেই। প্রচুর অর্থ ঐশ্বর্য সব আছে। সরকার দাদু বলেন যা দেখছিস্ আরও বেশি আছে আমাদের দেশের বাড়িতে। দাদু নাকি মস্তবড় জমিদার ছিলেন?

হাঁ।

শুধু হাঁ আর হাঁ বলছো। ঠিক করে বলোনা আব্বা এত অর্থ, এত ঐশ্বর্য থাকতে তুমি কেন চাকরি করো?

এবার প্রশ্নটা বড় কঠিন লাগলো বনহুরের কাছে। কি জবাব দেবে সে পুত্রের কথায় ভেবে পায় না, আমতা-আমতা করে বলে—ও কথা তোমার আম্মির কাছে জিজ্ঞাসা করো।

কেন, তুমি বলোনা আব্বু?

শোনো নূর, হাজার অর্থ এবং ঐশ্বর্য থাক তবু মানুষ কোনো দিন বসে বসে কাটাতে পারে না, তাই আমি চাকরি করি।

কি চাকরি করো বলবে না?

বলবো।

না, এক্ষুণি তোমায় বলতে হবে।

মহামুস্কিলে পড়লো বনহুর, একটু ভেবে নিয়ে বললো—যারা খেতে পায় না, তাদের সন্ধান করে খাবার ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়।

যারা দুঃস্থ জনগণ তাদের খাবার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হয় বুঝি?

হাঁ বাবা আমাকে সেই কাজ করতে হয়।

কত মাইনে দেয় তোমাকে?

যা আমার প্রয়োজন তাই পাই আমি। চলো নূর, ভিতরে যাই তোমার আম্মু কি করছেন দেখিগে।

আব্বু জানো আম্মু তোমার জন্য কত ভাবেন। তুমি যাওনা বলে আম্মুর মুখে কোনোদিন হাসিখুশি দেখিনা। আব্বু তোমার মালিককে বলো তিনি যেন মাসে একটিবার তোমায় ছুটি দেন।

আচ্ছা বলবো।

চলো আব্বু যাই।

নূর আর বনহুর বজরার ছাদ থেকে নেমে আসে নিচে।

সরকার সাহেব আর মনিরা আলাপ-আলোচনা করছিলো। বনহুর আর নূর আসতেই সরকার বলেন—নূর, আব্বুর সঙ্গে খুব গল্প করলে বুঝি?

হাঁ দাদু।

বনহুর বললো—এবার তোমরা যাও। বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, তাই না। বনহুর বেরিয়ে গেলো, একটু পরে ফিরে এসে বললো—চলো নূর, তোমরা খাবে চলো। চলুন সরকার চাচা, চলো মনিরা।

বনহুর সবাইকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলো কক্ষের বাইরে। ওপাশে বজরার আরও একটি কক্ষ আছে, সেই কক্ষটিতে খাবার জিনিসপত্র থরে থরে সাজানো আছে।

সুন্দর মসৃণ টেবিল।

টেবিলের দু'পাশ দিয়ে সাজানো কয়েকখানা চেয়ার। বনহুর বললো—বসো নূর। সরকার চাচা, আপনারা বসুন।

সরকার সাহেব এবং নূর বসে পড়লো।

মনিরা আর বনহুর বসলো অপর পাশে।

নূরের দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে, এত সুন্দর বজরা সে দেখেনি কোনোদিন। এত সুন্দর সাজসজ্জাও নূর দেখেনি। খাবার টেবিলে নানাবিধ খাবার থরে থরে সাজানো। যেন কোনো স্বপ্নরাজ্যে এসেছে সে। তার আব্বুকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো স্বপ্নরাজ্যের রাজকুমার যেন সে।

নূর খাওয়া ভুলে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো নির্বাক নয়নে।

খেতে খেতে হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় নূরের মুখের দিকে। মৃদু হেসে বলে বনহুর—নূর, তুমি খাচ্ছো না আব্বু?

নূরের সম্বিৎ ফিরে আসে, সে এবার লজ্জা পেয়ে যায় খুব করে, তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করে দেয়।

মনিরা নিজে যেন একেবারের বোবা বনে গেছে, সে শুধু চুপচাপ পুত্রের সঙ্গে পিতার অভিনয় দেখে যাচ্ছে একটি কথাও সে বলছে না।

সরকার সাহেব বেশ ক্ষুধাতুর হয়ে পড়েছিলেন তিনি খেতে শুরু করে দিয়েছেন।

বনহুর তাকালো মনিরার দিকে, ওর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই উভয়ে মৃদু হাসলো। বনহুরের চোখেমুখে খেলে গেলো একটা দুষ্টামির আভাস। মনিরা দৃষ্টি নত করে নিলো।

খাবার টেবিলে ছিলো স্তূপাকার ফলমূল।

বনহুর অন্যান্য খাবার রেখে শুধু ফলমূল খাচ্ছিলো। সরকার সাহেব এবং মনিরা জানে, ফল ওর প্রিয় খাদ্য, তাই ওর খাবার টেবিলে ফল থাকবেই।

নূর বললো—আব্বু, তুমি শুধু ফল খাচ্ছো?

পুত্রের কথায় চমকে উঠলো বনহুর, সে নানাভাবে নিজের আসল রূপ পুত্রের কাছে গোপন রেখে সভ্য নাগরিক রূপে নিজকে গুছিয়ে নিচ্ছিলো। ফল ভক্ষণ বনহুরের নেশা। শিশুকাল থেকে সে জঙ্গলে মানুষ, জঙ্গলের হিংস্র পশু তার ছিলো খেলার সাথী। জঙ্গলের ফল ছিলো প্রিয় খাদ্য। বনহুর সব

কিছু সামলে নিতে পেরেছে কিন্তু ফল ভক্ষণ করা সে কমাতে পারেনি। টেবিলে নানারকম খাদ্যসম্ভার সাজানো থাকলেও বনহুর ফলটাই তুলে নিতো আগে। ফল পেলে সে ভুলে যেতো অন্যান্য খাবারের কথা।

বনহুর অন্যান্য দিনের মত আজও গ্রোগ্রাসে ফল ভক্ষণ করছিলো। নূরের প্রশ্নে সে তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে খাবারের থালা টেনে নিলো।

মনিরা বললো—ফল পেলে তুমি সব ভুলে যাও।

বনহুর হেসে—খেতে শুরু করলো।

খাওয়া শেষ হলে সরকার সাহেব মনিরা ও নূর সহ পুনরায় সেই বড় কক্ষটায় এসে বসলো। এবার নূরকে বিদেশ পাঠানো ব্যাপারে নানারকম আলাপ আলোচনা চললো।

যদিও নূরের বয়স বেশি নয় তবু তাকে বিদেশে রেখে লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছা মনিরার অনেক দিনের, তাই সরকার সাহেবও এ ব্যাপারে আগ্রহশীল ছিলেন।

বনহুর নূরকে আদর করে জিজ্ঞাসা করলো তার কি ইচ্ছা।

নূর লেখা পড়ায় মনোযোগী সেই শিশুকাল থেকেই। এখন সে কিশোর তার ইচ্ছা বিদেশে যায় এবং সেখানে ভালভাবে পড়াশোনাদ করে।

বললেকা নূর—আব্বু, তুমি যদি বলো তাহলে আমি নিশ্চয়ই যাবো। আম্মি এবং সরকার দাদুর ইচ্ছা পূর্ণ করবো।

বনহুর নূরের পিঠ চাপড়ে বলে—সাবাস। তারপর সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বলে—আপনি আর বিলম্ব না করে নূরকে বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন সরকার চাচা।

বেশ, আমি তাই করবো। এতদিন শুধু তোমার মতামতের অপেক্ষায় ছিলাম।

সরকার চাচা, নূরকে বিদেশ পাঠাতে কত টাকা লাগবে জানাবেন আমি দেবো। বিদেশ থাকাকালীন তার কেমন খরচ লাগবে তাও বলবেন, যেন নূরের সেখানে কোনো অসুবিধা না হয়।

আচ্ছা, সব জানাবো।

মনিরার সঙ্গে বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হলো, বনহুর ওকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারে মনিরা, তাই সে মৃদু মৃদু হাসছিলো।

হয়তো সরকার সাহেবও বুঝতে পারেন তার ছোট সাহেব এখন নির্জনতা কামনা করছে। বললেন তিনি—নূর, চলো আমরা বজরার বাইরে গিয়ে বসি।

চলো দাদু, বাইরে সুন্দর জ্যোৎস্না রাত।

বজরা ভেসে চলেছে।

মাঝি ধীরে ধীরে বৈঠা টানছে। ইরামতি নদীর রূপালী পানিতে জ্যোৎস্নার আলো ঝলমল করছে। যেন চাঁদখানা সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে বজরার সঙ্গে।

নূর ও সরকার সাহেব এসে বসলো বজরার ছাদে। আজ নূরের মনে সীমাহীন আনন্দোচ্ছ্বাস—কতদিন পর' সে তার আব্বাকে কাছে পেয়েছে।

সরকার সাহেব আর নূর বেরিয়ে আসতেই বনহুর একটি সিগারেট বের করে তাতে আগুন ধরালো। একমুখ ধোয়া ত্যাগ করে বললো—মনিরা!

বলো?

জানো তোমাদের কেন ডেকেছি?

জানি বলেই আমি আসতে চাইনি, শুধু নূরের জেদে পড়ে এসেছি।

সত্যি কি তাই?

হঁ।

বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলে—সত্যি বলছো মনিরা?

হাঁ সত্যি।

বড় নিষ্ঠুর তুমি......কথাটা শেষ না করেই মনিরার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বনহুর, তারপর বলে—জানি অপরাধ আমি তাই বলে.........

মনিরা বনহুরের মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে—আমার এক বান্ধবী রাতে টেলিফোন করেছিলো, তোমার আগমনবার্তা কান্দাই শহরে সবার কানে গিয়ে পৌছেছে।

তাইতো নির্জন ইরামতি বেছে নিয়েছি মনিরা। কতদিন তোমার কোলে এমনি করে মাথা রেখে শুতে পারিনি। কতদিন তোমাকে......বনহুর মনিরাকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রাখে, ভুলে যায় সে সমস্ত অভিমান।

বজরার পাশ কেটে ছুটে চলা ইরামতির পানির ছলছল শব্দ বড় মধুর লাগে মনিরার কানে। বাইরে থেকে শোনা যায় সরকার সাহেবের গলার আওয়াজ। মাঝে মাঝে নূর কথা বলছে।

মাঝির দাঁড় টানার ঝুপঝাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মনিরার মুখখানা তুলে ধরে বনহুর, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। চুমোয় চুমোয় রাঙা করে দেয় ওর ওষ্ঠদ্বয়।

মনিরা বলে—ছিঃ সরকার চাচা এসে পড়তে পারেন।

তবু ছাড়বো না তোমাকে।

যদি নূর আসে?

এলোই বা। আরও নিবিড় করে ওকে টেনে নেয় বনহুর বুকে।

ছিঃ ছিঃ তুমি বড্ড দুষ্টো।

বলো, আরও বলো।

আঃ ছেড়ে দাও বলছি। ছাড়ো.........

ওরা কেউ আসবে না আমি জানি। মনিরা, সত্যি আমি অপরাধী, কতদিন তোমাদের সংবাদ নিতে পারিনি। মনিরা, মা কেমন আছে বললে না তো?

কই, তুমি তো জিজ্ঞাসা করোনি! সত্যি তুমি হৃদয়হীন, নাহলে মার কথা কেউ ভুলে যায়?

হাঁ, ঠিক বলেছো মনিরা! একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর— সর্বপ্রথম মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত ছিলো। জানি, মা আমার কথা কতবার বলেছেন কিন্তু আমি তার অপদার্থ ছেলে......বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের কণ্ঠস্বর।

মনিরা বুঝতে পারে স্বামীর মনে ভীষণ আঘাত লেগেছে। আপনভোলা তার স্বামী। তাদের পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভুলেই গেছে সব কথা।

মনিরা স্বামীর বুকে-গলার-চিবুকে হাত বুলিয়ে বলে—জানি তুমি আমাদের পেয়ে এত বেশি খুশি হয়েছিলো যার জন্য ভুলেই গিয়েছিলো তুমি তোমার সব কথা।

হাঁ মনিরা, কতদিন পর তোমাদের পেয়ে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। মা কেমন আছে মনিরা?

ভাল আছেন তবে তোমাকে কতদিন হলো দেখেন না, তাই তিনি সব সময় ভাবেন তোমার কথা।

মা, মাগো আমায় তুমি ক্ষমা করো। মনিরা কত সাধ জাগে বাড়ি যাই। মা, নূর এবং তোমাকে নিয়ে মনের আনন্দ পূর্ণ করি কিন্তু পারি না। কান্দাই পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মহল সজাগ হয়ে উঠেছে। তারা রাস্তায় রাস্তায় কড়া পাহারা নিযুক্ত করেছে, এমনকি আমার বাড়ির চারপাশে পুলিশ গোয়েন্দা সর্বক্ষণ নজর রেখেছে। তারা আমাকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে চায়।

আচ্ছা, একটি কথা আমাকে সত্যি করে বলবে?

কি কথা তোমায় মিথ্যা বলছি?

আচ্ছা, বলো তো কান্দাই রিলিফ প্রধানকে তুমি আটক করেছো কিনা?

মুহূর্তে বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠে। অধর দংশন করে কিন্তু কোনো জবাব সে দেয় না।

মনিরা স্বামীকে হঠাৎ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হতে দেখে বিব্রত হলো। সে জানে তার স্বামী যখন ভীষণ রাগ করে তখন সে কথা বলে না।

মনিরাও নিশ্চুপ থেকে যায়।

একটু পরে বলে বনহুর—শুধু রিলিফ প্রধান নয়, কান্দাইয়ের আরও বহু মহারথী অচিরে সেই নরপশুর সঙ্গ লাভ করবে। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বলো তো?

শহরময় একথা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দস্যু বনহুর কান্দাই রিলিফ প্রধানকে উধাও করেছে। সবাই বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি......

বনহুর সোজা হয়ে বসে বলে—তোমার অবিশ্বাসের কারণ?

· জানি, তুমি বিনা কারণে কাউকে বধ করোনা, তাই।
কে বললো আমি তাকে বধ করেছি?
তুমি তাহলে তাঁকে সত্যি আটক করে নিয়ে গেছো?
হাঁ মনিরা।
কিন্তু কেন? শুনেছিলাম কান্দাই রিলিফ প্রধান অতি সভ্য মহৎ ব্যক্তি, তাঁর ন্যায়নীতির জন্য কান্দাই সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন.........
অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—পুরস্কৃত করেছিলেন সরকার বাহাদুর রিলিফ প্রধানকে? চমৎকার! উপযুক্ত লোককেই সরকার খেতাব দান করেন এবং পুরস্কৃত করেন। হাজার হাজার দুঃস্থ জনগণের মুখের গ্রাস নিয়ে যারা ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে তুলেছেন তাঁরাই হলেন সরকার মহলের কর্মকর্তা। পুরস্কৃত না করে এদের কি অবহেলা দেখানো যায়? সর্বদা কত কষ্ট করে বিদেশের পাঠানো সাহায্য দ্রব্যগুলো গুদামজাত করার পর রাতের অন্ধকারে একগাদা কাগজের বিনিময়ে সীমান্তের ওপারে পার করে দিচ্ছে। কত সাধু, কত মহৎ কত মহান এরা। একটু থেমে দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর—শুধু রিলিফ দ্রব্য নয়, যে খাদ্যশস্য আমাদের দেশে আজকাল উৎপন্ন হচ্ছে তাতে দেশে এমন খাদ্যাভাব মোটেই ঘটতো না। এত ফসল ফলেও আজ চারদিকে শুধু হাহাকার। জানো মনিরা কত অসহায় মানুষ আজ খেতে না পেয়ে আত্মহত্যা করছে, কত পিতামাতা খেতে দিতে না পেরে সন্তান বিক্রি করছে, কত নারী খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ইজ্জত বিক্রি করে ক্ষুধা নিবারণ করছে। খোঁজ রাখো না এতোশত। খোঁজ রাখার তেমন কোনো প্রয়োজনও নেই। মনিরা, শুধু ছাপানো কাগজ... শুধু ছাপানো গাদা গাদা কাগজের বিনিময়ে দেশের সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে সীমান্তের বাইরে। কিন্তু করছে কারা তাদের সন্ধান কেউ কোনোদিন পায় না, আর পাবে কি করে তাঁরা হলেন দেশের মহান নেতার দল। মনিরা, চুপ করে আছো কেন দু' একটা কথার উত্তর দাও। জানি, কথা খুঁজে পাবে না। দিন দিন দেশের যে চরম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তাতে কেউ আর চুপ থাকতে পারবে না, উম্মাদের মত

চিৎকার করবে, তারপর প্রকাশ্যে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনবে যারা আজ স্বনামধন্য মহান ব্যক্তি সেজে সাধুতার বুলি আওড়িয়ে নিজেদের সাধুতার ফলাও করছে। যতই সাধুতার মুখোস পরে থাকুক তবু তারা রেহাই পাবে না......

তাহলে তুমি কি.........

হাঁ, রিলিফ প্রধান মহাশয় আমার স্বর্ণগুহায় আথিত্য বরণ করেছেন। তাঁকে রাশি রাশি স্বর্ণ ভক্ষণ করার জন্য আমি দিয়েছি। শুধু তিনিই নন, অচিরে জম্বুর কয়েকজন অধিনায়ক আমার কান্দাই স্বর্ণগুহায় আমন্ত্রণে আসবেন।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, এসব তুমি কি বলছো?

এসেছো স্ত্রীর অধিকার নিয়ে স্বামীর পাশে, বেশি না বুঝাই ভাল। তবে হ্যাঁ রিলিফ প্রধানকে আমি আটক করে নিয়ে গেলেও তাকে অমান্য করিনি। ঐশ্বর্যের ইমারত থেকে নিয়ে গেছি কিন্তু তাঁকে স্বর্ণ সিংহাসনে, স্বর্ণস্তূপের মধ্যে রেখেছি। ঘুমাবে স্বর্ণস্তূপে, খাবে স্বর্ণস্তূপ। কোটি কোটি দুঃস্থ জনগণের মুখের গ্রাস আত্মসাৎ করে যা চেয়েছিলো ঠিক তাই দিয়েছি......মনিরা, আমি তাই দিয়েছি। হাঁ, আরও অনেক মহান ব্যক্তি আছেন যাঁরা দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে লটারি খেলছেন, তামাসা মনে করছেন, ওরা শুধু কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করেই মরবে, করতে পারবে না কিছু, কিন্তু আর বেশিদিন নয়...তাদেরকেও স্বর্ণগুহায় আমন্ত্রণ জানানো হবে, ভক্ষণ করতে দেওয়া হবে স্বর্ণস্তূপ......ক্ষমা নেই তাদের, ক্ষমা নেই। না, হত্যা আমি কাউকে করবোনা—হত্যা করে তাদের রেহাই দেবো না আমি। ঐ দুঃস্থ জনগণ, যাহা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে মরে তাঁদের আমি বারণ করে দেবো যেন এইসব মহারথীকে হত্যা করে পরিত্রাণ না দেয়।

চুপ করো। চুপ করো কি হয়েছে তোমার বলো তো?

মনিরা, জানি না কেন ওদের নাম শুনলে আমার শরীর জ্বালা করে। আমি পারি না, পারি না নিজেকে সংযত রাখতে।

মনিরা বুঝতে পারে সবকিছু তাই সে স্বামীকে শান্ত করবার চেষ্টা করে।

ওদিকে সরকার সাহেব নূর সহ পাশের কক্ষে চলে যান। ঐ কক্ষটিতে সরকার সাহেব এবং নূরের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ।

পাশাপাশি দুটি শয্যা। একটিতে ঘুমালো নূর, অপরটিতে শয়ন করলেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

মনিরা স্বামীর মাথাটা তুলে নিলো কোলে, তারপর ধীরে ধীরে আংগুল বুলোতে লাগলো তার চুলের মধ্যে।

বজরা তখন এগিয়ে যাচ্ছে গন্তব্য পথে।

❑

সমস্ত রাত বজরা চলেছে।

ভোর হবার পূর্বে বজরা এসে ভিড়লো একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন গ্রামের সান বাঁধানো ঘাটে। আজানের ধ্বনি কানে যেতেই ঘুম ভাঙলো নূরের। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে বিছানায়। প্রথমে মনে হয় সে বুঝি তার শোবার ঘরে নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে এ তো তার শোবার ঘর নয় এ যে বজরা। তার বিছানা সহ কক্ষটা দোল খাচ্ছে। বজরার জানালা দিয়ে ভোরের বাতাস তার দেহ স্পর্শ করছে। দেখা যাচ্ছে বজরার পাশেই একটি পাকা মসজিদ। হয়তো বা সেই মসজিদ থেকেই ভেসে আসছে আজানের ধ্বনি।

পাশের বিছানায় তাকিয়ে দেখলো নূর, সরকার সাহেব কখন শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে গেছেন।

নূর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো বজরার বাইরে। অপরূপ দৃশ্য, বড় মধুর, বড় মনোরম। নূর কোনোদিন বুঝি এমন সুমধুর আজানের ধ্বনি শোনেনি। কোনোদিন বুঝি দেখেনি এমন পরিচ্ছন্ন সুন্দর গ্রাম।

বজরার পাটাতনে দাঁড়িয়ে নূর মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলো।

সরকার সাহেব বজরার ছাদে নামাজ পড়ছেন। মাঝিরা বজরাখানা ভালভাবে ঘাটে বাঁধছে। কতকগুলো লোক সাদা টুপি পরা ঘাটে অজু করছেন। এক একজনকে অতি পবিত্রময় মনে হচ্ছে। কতকগুলো গাছপালা ঘাটের আশে পাশে ঘিরে আছে।

গাছের ডালে ভোরের পাখি কিচির-মিচির করে ডাকছে। ঘাটের অদূরে একটি মস্ত বড় বাড়ি নজরে পড়লো। পুরানো হলেও বাড়িখানা আভিজাত্যপূর্ণ।

নূর অবাক হয়ে দেখছে।

এমন সময় তার পিঠে হাত রাখলো কে যেন। সঙ্গে সঙ্গে তার আব্বুর কণ্ঠস্বর—নূর, কি দেখছো?

আব্বু আমরা কোথায় এসেছি?

আমি এখানে থাকি।

তুমি এখানে থাকো আব্বু?

হাঁ,

তাই তো তুমি যেতে চাওনা। বড় সুন্দর এ গ্রাম! ঐ বাড়িখানা কার আব্বু?

আমাদের।

বাঃ ভারি সুন্দর। আমরা ঐ বাড়িতে যাবো?

হাঁ যাবে বৈকি। ও বাড়িতে আমরা থাকবো কিছুদিন। দাদীমার জন্য মন খারাপ করবে নাতো?

তুমি আছো, আম্মি আছে, সরকার দাদু আছেন, ক'দিন মাত্র থাকবো, মন খারাপ করবে না।

হাঁ ঠিক বলছো আব্বু। বললো বনহুর।

ততক্ষণে ঘাটে বজরা বাঁধা হয়ে গিয়েছিলো। মাঝিরা এসে বললো—হুজুর, মাল নামাবো কি?

বললো বনহুর—হাঁ, নামিয়ে নাও।

সরকার সাহেবের নামাজ পড়া হয়ে গিয়েছিলো, তিনিও এসে দাঁড়িয়েছেন বনহুর আর নূরের পাশে।

সরকার সাহেব আর নূর বজরার সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় নিচে।

বনহুর ফিরে তাকাতেই দেখতে পায় মনিরা এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে। বনহুর মনিরার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—সেই বিশ বছর আগে যে গ্রাম থেকে আমরা বিদায় নিয়েছিলাম, মনিরা এ সেই গ্রাম। সেদিন নৌকায় চেপে তুমি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ডেকেছিলে, এসো মনি ভাই......মনে পড়ে সে কথা।

লজ্জায় মনিরার মুখ রাঙা হয়ে উঠে। যদিও তার মনে নেই কিছু তবু হাসে সে।

বনহুর আর মনিরা নেমে যায় বজরা থেকে।

কতদিন পর বনহুর আর মনিরা ফিরে এসেছে গ্রামের বুকে। অবশ্য মনিরাকে এর পূর্বে কয়েকবার আসতে হয়েছিলো তার মামীমার সঙ্গে। এ ছাড়া তার দূর সম্পর্কের এক চাচাতো ভাই তাকে নিয়ে এসে জোরপূর্বক বিয়ে করতে গিয়েছিলো।

সেই বিয়ের আসর থেকে বনহুর তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো, কান্দাই শহরে তার মামীর কাছে, পৌঁছে দিয়েছিলো তাঁকে।

আজও মনিরা ভুলতে পারেনি সেদিনের কথাগুলো। কপালে চন্দনের আলপনা, গলায় ফুলের মালা। পরনে লাল শাড়ি। সমস্ত শরীরে অলঙ্কার পরে বসেছিলো মনিরা ঘোমটায় মুখ ঢেকে। চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছিলো ওর—হঠাৎ এমন সময় এক দপ্‌কা দমকা হাওয়ার মত কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সে, মনিরার কানে প্রবেশ করেছিলো একটি শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর—মনিরা? সঙ্গে সঙ্গে মনিরা ঘোমটা সরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। তাকিয়ে দেখেছিলো তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে মনির। ভাববার সময় না দিয়ে মনিরাকে সে তুলে নিয়েছিলো দুটি হাতের উপর, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিলো পিছন দরজা দিয়ে!

বাইরে অপেক্ষা করছিলো তাজ, বনহুর মনিরাকে নিয়ে তাজের পিঠে চেপে বসেছিলো তারপর আর কে পায় তাকে।

মনিরার বুকে সেদিন সেকি আনন্দোউচ্ছ্বাস বয়ে গিয়েছিলো—একটি ঘর্মাক্ত বুক তাকে নিবিড় করে নিয়েছিলো একান্ত আপনজনের মত।

আজও মনিরার মনে শিহরণ জাগায় ঐ দিনটির স্মৃতিগুলো। আজ স্বামীর সঙ্গে বজরা ত্যাগ করবার সময় সেদিনের স্মৃতিগুলো বারবার মনে পড়ছিলো।

সরকার সাহেব আর নূর ততক্ষণে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছে। সরকার সাহেবের অতি পরিচিত এ বাড়ি। তাই তিনি নূরকে সব ঘুরে ফিরে দেখাতে লাগলেন।

বাড়িতে যারা আত্মীয়স্বজন ছিলেন তারা সরকার সাহেব এবং মনির ও মনিরের বৌকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলেন। গ্রামবাসী সবাই এসে ভিড় জমালো চৌধুরীবাড়ির উঠানে।

নূর এত লোক দেখেনি, সে অবাক হয়ে গেছে। কেউ এনেছে চিড়া, গুড়, কেউ এনেছে তাল পিঠা, কেউ এনেছে মধুর হাঁড়ি। কেউ বা পুকুর থেকে বড় মাছ, কেউ বা খাসী-ছাগল, যে যা পারে নিয়ে এসেছে জমিদার পুত্র মনিরকে দেখতে।

বনহুর আর মনিরা অন্তপুরে প্রবেশ করলো। সরকার সাহেবের নির্দেশে পিতার ঘরখানাই বনহুরকে থাকার জন্য খুলে দেওয়া হলো।

বিরাট কক্ষ।

কক্ষমধ্যে পুরোন স্মৃতি জড়ানো বহু আসবাবপত্র থরে থরে সাজানো আছে। একপাশে মেহগনি কাঠের বিরাট খাট। একপাশে মেহগনির আলমারী, চেয়ার, টেবিল আরও কত কি। হাতির দাঁতে তৈরি বড় একটি চেয়ার। এই চেয়ারখানাতে মাহমুদ চৌধুরী নিজে বসতেন।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কক্ষের চারদিকে তাকালো। দু'চোখ তার ঝাপসা হয়ে এলো। রুমালে চোখ মুছলো বনহুর।

মনিরারও দু'চোখ ছাপিয়ে পানি বেরিয়ে এলো, সে আঁচলে চোখ মুছতে লাগলো।

সরকার সাহেব বললেন—আজ যদি বড় সাহেব থাকতেন তাহলে কত খুশি হতেন তিনি। পুত্র, পুত্রবধু নাতিকে পেয়ে......বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে তাঁর কণ্ঠস্বর।

নূর অবাক হয়ে দেখছিলো—শহরের দালানকোঠা শান শওকত আর এই পুরোন আমলের দালানকোঠা শান-শওকত কত তফাৎ। দালানে নানা কারুকার্য, দরজায় নানা ধরনের কাজ। খাট-চেয়ার-টেবিলে দক্ষ কারিগরের হাতের ছোঁয়াচ যেন সবই বিস্ময়।

প্রথম দিন কাটলো।

দ্বিতীয় দিন হাজার হাজার মানুষ এসেছে ছোট সাহেবের দর্শন আশায়। তারা ছোট সাহেবকে এক নজর দেখতে চায়।

সকাল থেকে চৌধুরী বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য! গ্রামের বৃদ্ধ, যুবক বালক, শিশু সবাই এসেছে ছোট সাহেবের দর্শনলাভ আশায়।

ছোট সাহেব বহুদিন পর এদেশে এসেছেন—গরিব দুঃখী সবাইকে তিনি প্রচুর অর্থ দান করবেন, কথাটা জানার সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী বাড়িতে হাজার হাজার দুঃস্থ জনগণ ভিড় জমাতে শুরু করলো।

এক সময় সরকার সাহেব এসে বনহুরকে বললেন—মনির, গ্রামবাসী তোমাকে দেখতে চায়। দুঃস্থ জনগণ তোমার কাছে পেতে চায় কিছু......

হেসে বললো বনহুর—বেশ তো, তারা যা চায় পাবে। তাদের ইচ্ছা আমি পূর্ণ করবো সরকার চাচা।

বনহুরের কথা শুনে খুশি হলেন সরকার সাহেব, তিনি ফিরে গিয়ে সবাইকে বললেন, ছোট সাহেব তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন।

কথাটা শুনে সবাই আনন্দে আত্মহারা হলো। ছোট সাহেবকে এক নজর দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে সবাই।

এমন সময় ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো এক বৃদ্ধ—হাতের লাঠি, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, চোখে কালো চশমা। বৃদ্ধ বহুদূর থেকে এসেছে, তার পায়ে হাঁটু অবধি ধূলো কাঁদা। পরনে একটা ছেড়া এবং তালিযুক্ত পাজামা আর সার্ট। চুলগুলো রুক্ষ এলোমেলো, চুলের ফাঁকে আটকে আছে খড়খুটো আগাছা। ভিখারি তার লাঠিখানা সম্বল করে নিয়ে হেঁটে-হেঁটে এসেছে। এতদূর।

ভিখারি এসে দাঁড়ালো ভিড়ের সম্মুখ ভাগে। বিপুল আশা আর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সে, কখন এসে দাঁড়াবে ছোট সাহেব তাদের সামনে, একনজর দেখবে তাকে সে।

বনহুর সহ সরকার সাহেব এসে দাঁড়ালেন চৌধুরীবাড়ির সিঁড়ির প্রথম সোপানে।

পিছনে স্তূপাকার খাদ্যসম্ভার এবং রেকাবির উপরে স্তূপাকার অর্থ। সরকার সাহেব ছোট সাহেবের হাতে তুলে দিচ্ছেন আর ছোট সাহেব তা তুলে দিচ্ছে গরিব বেচারীদের হাতে।

নূর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলো।

অদূরে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছে মনিরা। এক একজন এগিয়ে আসছে আর হাত বাড়িয়ে নিচ্ছে। এবার এগিয়ে এলো বৃদ্ধ, বনহুর ওর হাতে কাপড় এবং অর্থ তুলে দিতে গিয়ে থমকে পড়লো। এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বললো—নূর তুমি সরকার চাচার সঙ্গে একটু সরে যাও।

সরকার সাহেব অবাক হলেন।

নূরও আশ্চর্য না হয়ে পারলো না। সরকার সাহেব বুঝতে পারলেন যে ভিখারির হাতে মনির অর্থ এবং বস্ত্র তুলে দিতে গিয়ে থেমে পড়েছে নিশ্চয়ই সে স্বাভাবিক ভিখারি নয়। কে সে এসেছে ভিখারির বেশে কে জানে।

সরকার সাহেব আর নূর চলে গেলেন। বনহুর ভিখারির দিকে একটু ঝুকে বললেন—মিঃ জাফরী, জানতাম আপনি এখানেও আসবেন কিন্তু এ বেশে আপনাকে মোটেই মানাচ্ছেনা। কথাগুলো বলে বনহুর তার হাতে বস্ত্র এবং অর্থ তুলে দেয়।

মিঃ জাফরী ভাবতেও পারেননি তাঁর এ ছদ্মবেশ বনহুরের কাছে উদঘাটন হয়ে যাবে। তিনি ধীরে ধীরে সরে এলেন ভীড়ের বাইরে।

বনহুর কিন্তু অর্থ এবং বস্ত্রদানকালে লক্ষ্য করছিলো মিঃ জাফরী ভীড় ঠেলে কোনদিকে যান। মিঃ জাফরী সরে যেতেই বনহুর আর দু'তিন জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে দেওয়ার পর চলে গেলো ভিতরে। সোজা সে অন্তপুরে প্রবেশ করে মনিরাকে বললো—মনিরা পুলিশ এখানেও আমার পিছু নিয়েছে। আমি এক্ষুণি বিদায় নিচ্ছি। তোমরা সরকার চাচার সঙ্গে চলে যেও।

মনিরার মুখে কে যেন এক পোঁচ কালী মাখিয়ে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো—পুলিশ এখানেও পিছু নিয়েছে!

হাঁ মনিরা। নূর এবং সরকার সাহেবকে এক্ষুণি ডেকে পাঠাও আমি তাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

ঐ মুহূর্তে সরকার সাহেব আর নূর অন্তপুরে এসে পড়লেন।

বনহুর তাদের দেখে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—সরকার চাচা বিশেষ জরুরি কাজে এক্ষুণি আমাকে যেতে হচ্ছে। আপনি মনিরা এবং নূরকে নিয়ে চলে যাবেন। বাবা নূর তোমরা চলে যেও আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

সেকি আব্বু তুমি এক্ষুণি চলে যাবে?

হাঁ বাবা, কারণ চাকুরি স্থান থেকে ডাক এসেছে।

না গেলেই কি নয়?

যেতেই হবে। কথাটা বলেই বনহুর বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

সরকার সাহেব আর নূর দাঁড়িয়ে থাকেন।

মনিরার দু'চোখ ছাপিয়ে পানি আসছিলো তবু সে অতি কষ্টে নিজকে সামলে নেয়।

নূর বলে উঠে—চলো দাদু আব্বুকে বিদায় দিয়ে আসি।

আমরা চলো দুঃখী ব্যক্তিদের বিদায় করিগে। তোমার আব্বু যাচ্ছেন তুমি যদিও দুঃখীদের কাছে না যাও তা হলে ওরা অভিশাপ দেবে।

মনিরা—বললো হাঁ তুমি তাই যাও তোমার আব্বুর বাকি কাজটুকু তুমি সমাধা করোগে। নইলে দুঃখী বেচারীরা দুঃখ পাবে যে বাবা।

সরকার সাহেব নূর সহ বেরিয়ে গেলেন। অগণিত দুঃস্থ জনগণ দাঁড়িয়েছিলো। তারা সরকার সাহেব ও নূরকে পেয়ে পুনরায় আনন্দে আত্নহারা হয়ে উঠলো। সবাই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো তাদের দিকে।

ঐ মুহূর্তে সাধারণ দুঃস্থ বেশধারী কতকগুলো পুলিশ ফোর্স সহ জাফরী উপস্থিত হলেন সেখানে। সমস্ত বাড়িখানা ওরা ঘেরাও করে ফেললো।

নূর এবং অন্যান্য সবাই অবাক হয়ে গেলো ব্যাপার কি। অবশ্য পুলিশ মহল তাদের পরিচয় জানিয়ে বললো—এ বাড়িতে দস্যু বনহুর আছে তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

দস্যু বনহুর এ বাড়িতে আছে কথাটা শুনে নূরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, সে ছুটে গেলো মায়ের কাছে...ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—আম্মি আম্মি, সর্বনাশ হয়েছে দস্যু বনহুর নাকি আমাদের এখানে এসেছে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ফোর্স সাধারণ দুঃস্থ জনগণের বেশে এসেছে তাকে গ্রেপ্তার করতে। আম্মি তুমি সাবধান থেকো, আমি দেখছি কোথায় দস্যু বনহুর লুকিয়ে আছে।

মনিরার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে সে নির্বাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে পুত্রের মুখের দিকে। নূর পুনরায় বললো—আম্মি আব্বু চলে গেলেন আর এমন একটা বিপদ এলো। নিশ্চয়ই আব্বুর টাকার সন্ধান পেয়েছে সে তাই এসেছে এখানে.........কথাটা বলে নূর প্রবেশ করলো তার শোবার ঘরে।

মনিরাও পিছু পিছু এগিয়ে গেলো।

নূর ড্রয়ার খুলে বের করে নিলো রিভলবারখানা তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলো।

ততক্ষণে পুলিশ ফোর্স সমস্ত বাড়িখানা ঘেরাও করে তল্লাশী চালানো শুরু করে দিয়েছে।

দস্যু বনহুর এসেছে সংবাদ জানার পর দুঃস্থ জনগণ যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। সবার চোখে মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে—সবার মুখে ঐ এক কথা দস্যু বনহুর এসেছে, দস্যু বনহুর এসেছে.........

নূর যখন রিভলবার নিয়ে ছুটছে তখন সরকার সাহেব এসে দাঁড়ালেন—নূর কোথায় কাকে তুমি মারতে যাচ্ছো?

দস্যু বনহুরকে।

কোথায় দস্যু বনহুর?

এ বাড়িতেই আছে।

দস্যু বনহুরকে খুঁজে পাওয়া আমাদের কারো সাধ্য নাই।

সরকার সাহেবের কথা নূরের কানে প্রবেশ করলো কিনা কে জানে। ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে নূর।

মিঃ জাফরী দলবল সহ সমস্ত বাড়িখানা তখন চষে ফিরছেন।

নূর তখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিলো। তার হাতে উদ্যত রিভলবার। পাশ কেটে নেমে আসে একজন ভিখারিবেশী পুলিশ ইন্সপেক্টার। নূরকে আদর করে পিঠ চাপড়ে দেয়।

নূর একবার তাকিয়ে দেখে নেয় ইন্সপেক্টারকে, তারপর উঠে যায় উপরে।

ভিড়ের ফাঁকে পুলিশ ইন্সপেক্টার নিচে নেমে যায়, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় দুঃস্থ জনগণের মধ্যে।

মিঃ জাফরী তখন হন্তদন্ত হয়ে প্রতিটি কক্ষে সন্ধান করে চলেছেন। মিঃ জাফরীর সঙ্গেই রয়েছেন নূর আর সরকার সাহেব।

নূরের চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ বিদ্যমান।

হঠাৎ একটি পুলিশ ব্যস্ত সমস্তভাবে ছুটে এলো, মিঃ জাফরী লক্ষ্য করে বললো—স্যার, ঐ দিকের দোতলার একটি চোরা কুঠরির মধ্যে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন ইন্সপেক্টার রশিদ সাহেব।

বলো কি?

হাঁ স্যার।

সবাই মিলে ছুটলো দোতলার সেই চোরা কুঠরিটার দিকে। পুলিশ মহল তো গেলোই, তাদের সঙ্গে সরকার সাহেব এবং নূরও গিয়ে হাজির হলো।

তারা সবাই বিস্মিত হতবাক হয়ে পড়েছেন। হাত পিছ মোড়া অবস্থায় বাঁধা, পা দু'খানা বাঁধা, চোখে-কানে রুমাল বাঁধা, মুখে রুমাল গোঁজা, চোরা কুঠরি মেঝেতে পড়ে আছেন ইন্সপেক্টার রশিদ সাহেব।

বৃদ্ধ হলেও রশিদ সাহেবের মত বলিষ্ঠ পুরুষ কমই নজরে পড়ে। একমুখ দাড়ি গোঁফ, দুটো উজ্বল দীপ্ত চোখ—ভদ্রলোক পুরোন অফিসার, বয়স অনেক হয়েছে। অবসর মুহূর্ত প্রায় সন্নিকটে। মিঃ রশিদ মিঃ জাফরীর সঙ্গে ইদানীং দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার ব্যাপারে আগ্রহী এবং এ ব্যাপারেই তিনি এসেছেন কান্দাই শহর ছেড়ে পিয়ারু গ্রামে। অবশ্য এ গ্রামটির আরও

একটি নাম আছে, কেউ বলে মধুপুর, কেউ বলে পিয়ারু গ্রাম। এ গ্রামেই ছিলেন মাহমুদ চৌধুরী দীর্ঘ ত্রিশটা বছর, তারপর তিনি কান্দাই শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। মিঃ রশিদ যখন উপরে উঠে গিয়ে একাই একটি কক্ষে দস্যু বনহুরের সন্ধান করছিলেন তখন তার পিছন থেকে কে যেন বলিষ্ঠ হাতে ধরে ফেলে এবং তাকে বেঁধে ফেলে তাঁর মুখে রুমাল গুঁজে দেয়।

রশিদ সাহেবের হাত পার বাঁধন মুক্ত করে দিতেই তিনি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন, তিনি বললেন দস্যু বনহুর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে তাকে খুব করে কষে বেঁধে রেখে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

নূর চমকে উঠলো, তাদের চোরা কুঠরির মধ্যেই তাহলে আত্মগোপন করেছিলো দস্যু বনহুর। ছুটে গেলো নূর মায়ের কাছে এবং তাকে সব কথা খুলে বললো। আম্মি, দস্যু বনহুর আমাদের এই বাড়িরই দ্বিতলের একটি চোরা কুঠরির মধ্যে লুকিয়ে ছিলো। পুলিশ ইন্সপেক্টার সেই কুঠরির মধ্যে প্রবেশ করে দস্যু বনহুরকে খুঁজছিলেন, ঠিক ঐ সময় তাঁকে পিছন থেকে সে ধরে ফেলে এবং তাঁকে বেঁধে রেখে পালাতে সক্ষম হয়। আম্মি, কত বড় দুঃসাহস তার দেখেছো?

হাঁ বাবা, সে যে অনেক বড় দুঃসাহসী তা আমি জানি। পুলিশ ই· ·পেক্টার কেন কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। মনিরা কথাগুলো এক নিশ্বাসে বললো।

নূর বললো—আম্মি ,তুমি সব সময় বলো দস্যু বনহুর অনেক বড় দুঃসাহসী বীর পুরুষ, তাকে কেউ কোনোদিন গ্রেপ্তার করতে পারবে না। আম্মি, দস্যু বনহুরের প্রতি তোমার এত বিশ্বাস কেন বুঝতে পারি না।

মনিরা বলে উঠে—লোকমুখে শুনেছি তাই আমার এ বিশ্বাস বাবা।

তুমি যাই বলো আম্মি, দস্যু বনহুর যত বড় বীর পুরুষই হোক না কেন, তাকে আমি বড় হয়ে গ্রেপ্তার করবোই করবো।

মনিরা কোনো জবাব দিলো না।

নূর ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে। এবার সে বুঝতে পারলো পুলিশ ইন্সপেক্টার রশিদ সাহেবের বেশে যে তাকে আদর জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে

নিচে নেমে গেলো, সেই হলো দস্যু বনহুর। একমুখ দাড়ি, গোঁফ, মাথায় টুপি, কাঁধে একটি ব্যাগ। নূর ভাবতে থাকে সে যদি জানতে পারতো ঐ লোকটি দস্যু বনহুর তাহলে সে কিছুতেই ছাড়তো না, তাকে যেমন করে হোক গ্রেপ্তার করতোই কিন্তু সে জানে না কে ছিলো সে ব্যক্তি।

প্রায় ঘন্টা দুই সন্ধান চালানোর পর বেরিয়ে গেলো পুলিশ বাহিনী। তারা চৌধুরীবাড়ির অনতিদূরে গাড়ি রেখে গোপনে এসেছিলেন বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে কিন্তু তাঁরা বিফলকাম হয়েছে।

এমন পরাজয় হবে ভাবতে পারেননি মিঃ জাফরী, তিনি মুখ চুন করে ফেলেছেন। অন্যান্য পুলিশ অফিসার সবার মুখমণ্ডলই মলিন বিষণ্ন। তাঁরা তখনই ফিরে যাবার জন্য ব্যবস্থা করছিলেন কিন্তু সরকার সাহেব ছাড়লেন না, তিনি তাঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

পুলিশ মহল এতে খুশি হলেন, কারণ তারা বহুদূর থেকে এসেছেন, ক্ষুধার্ত ছিলেন ভীষণ ভাবে।

খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে বিদায় গ্রহণ করতে প্রায় ঘন্টা তিন চার লেগে গেলো, তারপর বিদায় গ্রহণ করলেন।

মিঃ জাফরী দল বল নিয়ে চলে গেলেও একজন ডিটেকটিভ তিনি গোপনে রেখে গেলেন চৌধুরীবাড়ির দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য।

ডিটেকটিভ মিঃ সুলতান সেই বাড়ির একজন দারোয়ান হিসেবে আত্মগোপন করে রইলো। বাড়ির কেউ তাকে চিনতে না পারলেও পুরোন চাকর নাসির তাকে চিনতে পারলো। এই দারোয়ান তাদের পুরোন দারোয়ান নয়, তবু সে কারও কাছে কোনো কথা বললো না।

মনিরার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা সব যেন নিমিশে মুছে গেছে। বিষণ্ন মনে বসেছিলো নিজের ঘরে। আগামীকাল তারা পুনরায় কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দেবে।

সরকার সাহেব এবং নূর বজরায় গেছে, সবকিছু গোছগাছ করে নিচ্ছে তারা।

মনিরা শুয়ে শুয়ে ভাবছে কত কথা। এত দূরে এসেছে তবু স্বস্তি পেতে দিলো না, পুলিশ মহল পেয়ারু গ্রামেও এসে পড়েছিলো তার স্বামীর সন্ধানে। বারবার স্বামীর মুখখানা ভাসছিলো তার চোখের সামনে।

এমন সময় এক গেলাস দুধ নিয়ে কক্ষমধ্যে উপস্থিত হলো পুরোনো ভৃত্য মালিক মিয়া।

পদশব্দে চোখ তুলে তাকালো মনিরা, বললো—কে মালেক?

হাঁ বৌরাণী, আমি মালেক। এই গরম দুধ টুকু খেয়ে নিন।

না, এখন অসময়ে দুধ খাবো না।

ততক্ষণে মালেক মিয়া একেবারে শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু ঝুকে চাপাকণ্ঠে বলে মালেক মিয়া—বৌরাণী......

কে তুমি!

হাঁ চুপ......

কিন্তু......

কোনো কিন্তু নয়, আমি তোমাদের পাশে থাকবো কান্দাই পৌঁছানো অবধি......

সত্যি তুমি আছো......মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রাখলো।

মালেক মিয়া বেশি দস্যু বনহুর মনিরাকে নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিয়ে বললো—তবে এখনও আমি নিশ্চিন্ত নই মনিরা, কারণ আমাদের দরজায় এখন যে ব্যক্তি দারোয়ান বেশে পাহারায় রত আছে সে একজন দক্ষ ডিটেকটিভ, নাম তার মিঃ সুলতান হোসেন।

সত্যি বলছো? অবাক কণ্ঠে বললো মনিরা।

বনহুর বললো—হাঁ সত্যি এবং সে সর্বক্ষণ এ বাড়ির সবার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।

মনিরা বললো—আসল মালেক মিয়া তাহলে কোথায় উধাও হলো?

কৌশলে সরিয়ে দিয়েছি, অবশ্য তাকে কোনো অসুবিধা পোয়াতে হয়নি বা হচ্ছে না। আমরা চলে গেলেই সে ফিরে আসবে।

জানো নূর তোমাকে......

জানি? হেসে বললো বনহুর—সব শুনেছি।

তবু হাসছো তুমি?

নিজের সন্তানের কাছে আত্মগোপন এটা আমার জীবনে কম দুঃখের কথা নয় তবু হাসি মনিরা, না হেসে কি করবো বলো?

এমন সময় বাইরে কারও পায়ের শব্দ শোনা যায়।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে বলে, নিন বৌরাণী, আপনার দুধটুকু খেয়ে নিন।

মনিরা দুধের গেলাস হাতে নেয়।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে নূর এবং সরকার সাহেব। নূর মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়—আম্মি, আমাদের সব তৈরি হয়ে গেছে কাল সকালেই আমরা রওয়ানা হবো।

সরকার সাহেব বললেন—হাঁ মা, তোমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও, সকালে আমরা রওয়ানা দেবো।

মনিরা দুধের গেলাস মালেক মিয়ার হাতে দিয়ে বলে—মালেক ভাই, এবার তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে, কেমন?

মালেক মিয়া দাঁড়িতে হাত কচলিয়ে বলে—বৌরাণী, আপনার যখন ইচ্ছা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তখন আপত্তি করতে পারি? যাবো তবে......

বলো, থামলে কেন মালেক চাচা? বললো নূর।

মালেক মাথা চুলকে বললো—দু' একদিন থেকেই চলে আসবো কিন্তু।

মনিরা হেসে বললো—চিরদিন কি তোমাকে আমরা ধরে রাখতে পারবো মালেক ভাই। বেশ, তুমি যখন আসতে চাও এসো।

নূর খুশি হয়ে বলে—মালেক চাচা কিন্তু সুন্দর গল্প জানে। জানো আম্মি এখানে যেদিন প্রথম এলাম সেদিন মালেক চাচা একটি গল্প বলেছিলো। ভারী অদ্ভুত গল্প, তুমি যদি শুনতে। অবশ্য মালেক চাচা এখনও শেষ করেনি। মজা হবে, গল্পটা বজরায় বসে বসে শুনবো।

মালেক মিয়া বেশি বনহুর শুধু হাসলো, কোনো জবাব দিলো না। কারণ আসল মালেক মিয়া নূরকে কোন্ গল্প শুনিয়েছিলো তা সে জানে না।

বেরিয়ে গেলো মালেক মিয়া।

সরকার সাহেব আর নূরও বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

পরদিন।

চৌধুরী বাড়ি ত্যাগ করে সবাই বেরিয়ে এলো বাইরে। আজ আবার গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়েছে বৌরাণীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। ছোট

সাহেব নেই, তিনি হঠাৎ চলে গেলেন এ দুঃখ গ্রামবাসীগণ ভুলতে পারে না। সবাই নীরবে চোখ মুছতে লাগলো।

সরকার সাহেব সবার সঙ্গে হেসে কথাবার্তা বলে বিদায় নিচ্ছিলেন।

মহিলা মহলে দাদী মামী ফুফু চাচী সবাই এসে ভিড় জমিয়েছে। বহুদিন পর এসেছিলেন ওরা—দু'চার দিন থেকেই চলে যাচ্ছে, এই হলো তাদের দুঃখ, সবার চোখে পানি আঁচলে চোখ মুছছে কেউ কেউ।

যা কিছু জিনিসপত্র মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছে বাড়ির চাকর বাকরের দল। মালেক ভাইও মস্ত এক পুঁটলি মাথায় নিয়েছে, তার অর্ধেকটা মুখ ঢাকা পড়ে গেছে পুঁটিলির আড়ালে।

সবাই যখন ভিড় করে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলো তখন অন্য চাকর বাকরের দলের সঙ্গে মালেক মিয়াও এসে উঠলো বজরায়।

এক সময় বজরা ছাড়লো।

ডিটেকটিভ মিঃ সুলতান ওয়্যারলেসে মিঃ জাফরীকে জানালেন, চৌধুরী বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেলেন মিসেস মনিরা ও তার ছেলে নূর। সঙ্গে বৃদ্ধ সরকার সাহেব, আর কেউ ছিলো না তাদের সঙ্গে।

মিঃ জাফরী সংবাদ শুনে বুঝতে পারলেন দস্যু বনহুরও গ্রাম ছেড়ে ভেগেছে। মিঃ জাফরী সুলতান সাহেবকে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন।

স্বয়ং দস্যু বনহুর যে তারই চোখের সম্মুখ দিয়ে চাকরের বেশে পুঁটলি মাথায় বেরিয়ে গেলো এটা সুলতান সাহেব দক্ষ গোয়েন্দা হয়েও টের পেলেন না।

বজরা ছাড়ার পর তিনিও একটি পানসী নৌকা ধরে অদূরস্থ বন্দর অভিমুখে রওয়ানা দিলেন।

বজরা এগিয়ে গেছে তখন অনেক দূর।

❑

মনিরা মাঝের বড় কামরায় শুয়েছিলো চুপচাপ। যদিও সে ঘুমায়নি তবু তার চোখ দুটো বন্ধ ছিলো, ভাবছিলো এ বজরাখানা তার স্বামীর। এই

বজরার প্রতিটি স্থানে রয়েছে তার স্বামীর স্পর্শের উষ্ণ ছোঁয়াচ। সবচেয়ে তার বড় আনন্দ হচ্ছে তাদের সঙ্গেই রয়েছে তার স্বামী, এ শুধু আনন্দ নয়, পরম খুশির কথা। কিন্তু কেউ জানে না, এমন কি সরকার সাহেবও জানে না। জানে না নূর। যদিও মনিরার পাশে তেমন করে সে আসতে পারেনি কিন্তু দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে দূর থেকে দু'জনার।

মনিরা মাঝে মাঝে চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে দেখছিলো যদি কান ছিলো বাইরের দিকে কিন্তু দৃষ্টি ছিলো বেলোয়াড়ী ঝাড়ের দিকে।

না তাকালে বাইরের কথাগুলো যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না, তাই মাঝে মাঝে মনিরা সতর্কতার সঙ্গে চোখ মেলে তাকাচ্ছিলো।

বজরা চলার সঙ্গে সঙ্গে বজরার ছাদে লটকানো ঝাড়বাতি দোল খাচ্ছিলো, তার সঙ্গে সঙ্গে মনিরার মনটাও যেন দোল খাচ্ছিলো আনন্দের আবেশে। যা হোক একটিবার তবু ওকে পাশে পাবে সে নিবিড়ভাবে। শোনা যাচ্ছিলো নূরের গলার স্বর—বলোনা মালেক চাচা সেই গল্পটা?

মালেকবেশী বনহুর বিব্রত হয়, কারণ সে জানে না কোন্ গল্প বলছিলো সেই মালেক মিয়া। একটু ভেবে নিয়ে বললো সে—গল্পটা সব ভুলে বসে আছি। দেখলে তো কেমন বিপদ আপদ গেলো। তুমি যদি একটু বলো তাহলে সব মনে পড়ে যাবে।

মালেক চাচা, যে গল্প তুমি বলছিলে তা তো তোমার ভুলে যাওয়ার কথা নয়, সে তো তোমার জীবন-কাহিনী—চৌধুরী বাড়ির ইতিকথা......

ও, এবার মনে পড়েছে সেই গল্প মানে আমি এ বাড়িতে কেমন করে এলাম এই তো?

না না, তুমি সব ভুলে বসে আছো।

একেবারে ভুলে বসে আছি বাবা, তুমি যদি একটু বলতে?

আচ্ছা তুমি যতটুকু বলেছিলে আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলছি। তুমি যখন চৌধুরী বাড়ি প্রথম এলে তখন সব তোমার কেমন আশ্চর্য লাগছিলো এমন মস্তবড় বাড়ি কোনোদিন দেখোনি, দেখোনি এমন শান শওকত.........

হাঁ, কিছু কিছু মনে পড়ছে, তারপর?

তারপর এ বাড়ির সবকিছু তোমাকে অবাক করে তুললো, সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলে তুমি চৌধুরী বাড়ির ছোট সাহেবকে দেখে......

কেন?

বোকা, তুমি সব ভুলে বসে আছো দেখছি?

হাঁ, বাবা বুড়ো মানুষ সব ভুলে বসে আছি। আর একটু বলো না?

বলছি শোন......তুমি এসে দেখলে চৌধুরী বাড়ির সবার আদরের ধন নয়নের মনি ছোট সাহেবকে। ছোট্ট কচি ফুলের মত সুন্দর মুখ, সুন্দর নাক, আরও সুন্দর তার চোখ দুটো। নাম ওর মনির......

মনির!

হাঁ, একেবারে সব ভুলে গেছো দেখছি? মনি বলে সবাই ওকে ডাকতো। মনি মানে আমার আব্বু বুঝলে?

ও এবার সব মনে পড়েছে—তারপর?

মনিকে কোলে নেবার বড় সখ হচ্ছিলো তোমার কিন্তু মনিকে স্পর্শ করার সাহস ছিলো না দূর থেকে ওকে চেয়ে চেয়ে দেখতে। সমস্ত দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও তোমার একটা চোখ পড়ে থাকতো মনির দিকে। বেগম সাহেব দোলনায় মনিকে শুইয়ে রেখে যখন এদিক ওদিক যেতেন তখন তুমি গিয়ে নাকি চুপিচুপি তাকে আদার করতে......

হাঁ, এবার সব মনে পড়ছে।

তাহলে বলো।

আচ্ছা বলছি—একদিন কোলে তুলে নিয়ে যেমন আদর করতে গেছি অমনি মনি আমার কোলে পায়খানা করে দিয়েছে...

হেসে উঠলো নূর—দূর তাই নাকি? তুমি মনিকে কোলে তুলে নেবার সাহসই পাওনি। শুধু ওর চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে আদর করছিলে, ঠিক এমন সময় আমার দাদু এসে পড়লেন, খুব করে বকা দিলেন তোমাকে। ময়লা হাতে কেন তুমি মনিকে ছুঁতে গেলে। এমন সময় মনির মা মানে আমার দাদীমা এসে পড়লেন সেখানে, তিনি দাদুকে রাগ করতে দেখে সব জিজ্ঞাসা

করলেন। দাদু বললেন দেখেছো মালেকের সাহস মনির চিবুকে হাত দিয়েছিলো। দাদীমা তো দাদুর কথা শুনে হেসেই খুন। বললেন দাদীমা— তোমরা সবাই মনিকে আদর করো আর মালেকের বুঝি ইচ্ছা হয় না ওকে আদর করতে......দাদু তো রেগে ভূত—তিনি বললেন—বলো কি বেগম সাহেবা, মালেক ময়লা হাতে মনিকে ছোঁবে? এই নিয়ে দাদু আর দাদীমার মধ্যে শুরু হলো ভীষণ ঝগড়া। দাদী বলছেন, একশো বার ছোঁবে আর দাদু বলছেন, না, ময়লা নোংরা হাতে ওকে কিছুতেই ছুঁতে দেবো না।

তারপর?

তুমিই তো ভাল জানো মালেক চাচা?

বললাম তো সব ভুলে গেছি।

বড্ড ভোলা তুমি মালেক চাচা, শোন তবে—দাদু আর দাদীমার যখন মনিকে নিয়ে ভীষণ ঝগড়া তখন তুমি পালিয়ে গেছো সেখান থেকে। ভয়ে তুমি গিয়ে লুকিয়েছো ধানের গোলার নিচে। না জানি তোমার ভাগ্যে কি আছে তাই গোলার নিচে বসে বসে ভাবছো। হঠাৎ একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে যেতেই তুমি চমকে উঠেছিলে, পিছন ফিরে দেখো মস্তবড় একটা সাপ। তুমি না পারছো চিৎকার করতে না পারছো বেরিয়ে আসতে। সাপটা এগিয়ে আসছে তোমার দিকে। তুমি চোখ বন্ধ করে খোদার নাম স্মরণ করছো। তারপর তুমি নাকি দেখতে পাচ্ছো কোথায় সাপ, মনি হামাগুড়ি দিয়ে আসছে তোমার দিকে, তারপর এসে মনি তোমার গলা জড়িয়ে ধরলো দু'হাত দিয়ে। তারপর তোমার যখন হুশ হলো দেখলে সাপটা জড়িয়ে আছে তোমার গলায়......

সর্বনাশ, তারপর কি হলো?

মালেক চাচা, তারপর কি হলো তুমি বলো? সেই বাকি কাহিনীটুকু শোনার জন্যই তো আমি........

মালেকবেশী বনহুর ভুলেই গিয়েছিলো সে পুত্রের সম্মুখে পুরোন চাকর মালেকের ভূমিকায় অভিনয় করছে। তাড়াতাড়ি নিজকে সামলে নিয়ে বলে বনহুর—হাঁ, এবার সব মনে পড়ছে, সাপটা গলায় জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে

আমি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যখন আবার হুশ হলো তখন দেখলাম বাড়ির সবাই আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর মাথায় পানি ঢালছে একজন চাকর। চাকরটা আমাকে বড় ভালবাসতো।

তোমার জ্ঞান ফিরলে সাপটাকে আর বুঝি দেখতে পাওনি?

হাঁ, হাঁ, পেয়েছিলাম, সেকি মস্তবড় সাপ! যেমন কালো তেমনি মোটা।

সাপটাকে ওরা মেরে ফেলেছিলো?

তা তো বটেই, এতবড় সাপটাকে কি জীবন্ত রাখা যায়? চলো নূর, এবার ঘুমাবে চলো।

পাশের কামরা থেকে ভেসে আসছিলো তখন সরকার সাহেবের নামাজ পড়ার শব্দ। তিনি ছুরা পাঠ করছিলেন।

নূর বললো—আচ্ছা চলো মালেক চাচা। উঠে দাঁড়ালো নূর।

মালেক চাচাও উঠে পড়লো।

বজরার সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মালেক মিয়া নূরের হাত ধরে নামিয়ে নিলো নিচে।

যে কামরায় সরকার সাহেব নামাজ আদায় করছিলেন সেই কামরায় নূরের বিছানা পাতা ছিলো। মালেক মিয়া নূরকে শুইয়ে দিয়ে ওরা পা মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে নূর।

সরকার সাহেবের ততক্ষণে নামাজ শেষ হয়ে এসেছিলো, তিনি মোনাজাত করে জায়নামাজ ত্যাগ করলেন।

মালেকবেশী দস্যু বনহুর ততক্ষণে নূরের পাশে মেঝেতে শুয়ে পড়লো।

সরকার সাহেব বললেন—বজরা এখন কতদূর রে মালেক?

শুয়ে পড়ে শরীরে চাদরচাপা দিতে দিতে বলে মালেক মিয়া—বজরা এখন রসুলপুর গ্রাম ছেড়ে ঝিদের গ্রামের পাশ দিয়ে চলেছে।

সরকার সাহেব দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে দেহটা এলিয়ে দিলেন, তারপর চললো কিছুক্ষণ সরকার সাহেব আর মালেক মিয়ার মধ্যে কথাবার্তার পালা।

তারপর একসময় সরকার সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি বড় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন—বৃদ্ধ মানুষ, সমস্ত দিন এতটুকু বিশ্রাম হয়নি তাঁর।

দাঁড় টানার ঝুপঝাপ শব্দ হচ্ছে।

বজরার ছাদের বেলোয়াড়ী ঝারে দুলছে মোমবাতিগুলো।

মনিরা নিশ্চুপ পড়ে রইলেও সে ঘুমায়নি, অবশ্য চোখ দুটো তার যদিও বন্ধ ছিলো। সে যতক্ষণ মালেকবেশী তার স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলো ততক্ষণ কান পেতে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিলো। মনিরা কিন্তু জানে, নূরকে কোনোরকমে ভুলিয়ে সময় কাটানোর অবসর খুঁজে নিচ্ছে তার স্বামী।

মনিরার চিন্তা অবশ্য মিথ্যা নয়, মালেকবেশী বনহুর চায় ধীরে ধীরে রাত বেড়ে আসুক, সরকার সাহেব শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিক এবং নূর ততক্ষণে গল্প শুনতে শুনতে বার বার হাই তুলুক। সরকার সাহেবের নামাজ পাঠের শব্দ বন্ধ হয়ে যাবার পূর্বেই মালেক মিয়াও নূরের কথাবার্তা থেমে গিয়েছিলো। শোনা গিয়েছিলো সিঁড়ির ধাপে নূর ও মালেকের পায়ের শব্দ। মনিরা বুঝতে পেরেছিলো ওদের গল্প বলা শেষ হয়ে গেছে। মনিরার বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠেছিলো—ভয়ে নয় আনন্দে, একটা দীপ্ত বাসনায়। নূর ও সরকার সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেই আসবে ও।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলো।

উন্মুখ হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করছে মনিরা। উজ্জ্বল জলরাশির কলকল আওয়াজ চিরে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে দূরে নদীতীরস্থ কোনো ধানক্ষেত থেকে খেঁক শিয়ালীর চিৎকার।

হঠাৎ দরজা খুলে গেলো।

মনিরার বুকের মধ্যে এক ঝলক উষ্ণ রক্ত ছলাৎ করে ছড়িয়ে পড়লো। আনন্দ উচ্ছলতায় মনটা তার যেন ভরে উঠলো নিমিশে—এবার এসেছে সে।

মনিরা চোখ না মেলে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো চুপচাপ।

পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

মনিরার নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে, এগিয়ে আসছে ও। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে। একটা শিহরণ অনুভব করছে ভিতরে ভিতরে

মনিরা। যদিও মনিরা আজ ক'দিন একান্ত পাশেই পেয়ে এসেছে স্বামীকে, তবু তাকে পাশে পাওয়ার অনাবিল উচ্ছ্বাসকে সে দমন করতে পারছে না এ মুহূর্তে।

পাশে এসে বসলো মালেক বেশী বনহুর। তার দেহে যদিও মালেকের পোশাক এখনও ছিলো কিন্তু দাঁড়ি ছিলো না তার মুখে, গোঁফও নয়। সুন্দর পৌরুষদীপ্ত একটি মুখ।

মুখখানা ধীরে ধীরে নেমে এলো মনিরার মুখের উপর, চাপাকণ্ঠে ডাকলো—মনিরা উঠো......

চোখ মেললো মনিরা—উঁ বলো?

ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

না।

সত্যি?

হাঁ, তুমি আছো বজরায় আমি ঘুমোতে পারি? ওগো, এমনি করে কতক্ষণ তুমি থাকবে আমাদের পাশে পাশে?

যতক্ষণ কান্দাই শহরে সন্নিকটে বজরা খানা না পৌঁছবে।

তুমি নেমে যাবে পথের মাঝে?

তা ছাড়া উপায় কি বলো?

না, তা হবে না।

কিন্তু তুমি তো জানো, হীরাঝিলে, ইরামতি তীরে বজরা নোঙ্গর করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মহলের গোয়েন্দা বিভাগ সবার অলক্ষে এসে হাজির হবে, এমন কি তাদের দলে মিঃ জাফরী থাকাটাও কিছু বিস্ময়কর হবে না। তাই আমি চাই হীরাঝিল পৌঁছবার পূর্ব মুহূর্তে আমি নেমে যাবো।

যত সহজ তুমি ভাবছো তত সহজ হবে কি তোমার নেমে যাওয়াটা?

কেন হবে না, নূর এবং সরকার সাহেবকে বলে আমি নেমে যাবো।

তারা যদি তখন আপত্তি করে বসে?

জানি আপত্তি তারা করবে কিন্তু আমাকে একটা পথ বেছে নিতে হবে। অবশ্য মালেক মিয়ার কোনো এক আত্নীয়ের বাড়িছিলো হীরাঝিলের সন্নিকটে হাজারা গ্রামে। বাস্ আমি হাজারায় নেমে যাবো, কেমন?

তারপর কবে আবার দেখা পাবো তোমার?

যেদিন তুমি স্মরণ করবে।

মনিরা স্বামীর জামার আস্তিন চেপে ধরে দু'হাতের মুঠায়—সত্যি চলছো আমি যখন তোমাকে স্মরণ করবো তখনই আসবে তো?

হাঁ, নিশ্চয়ই আসবো।

যদি না আসো?

শাস্তি দিও।

মনে থাকে যেন।

থাকবে।

ওগো, ভেবেছিলাম ক'দিন তোমাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে নিশ্চিন্তে কাটাবো। শহরের আকাশে চাঁদ কোনোদিন নজরে পড়ে না, তাই প্রাণভরে জ্যোৎস্নার আলো দেখবো। মুক্ত বাতাস পাই না শহরে, শুধু ফ্যানের হাওয়া—উঃ একেবারে প্রাণভরে আমরা নিশ্বাস নেবো, কিন্তু.....একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আবার বলে মনিরা—সব আশা আমার ব্যর্থ হয়ে গেলো।

বনহুর ওকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলে—কোনো দুঃখ করো না, সব আশা তোমার পূর্ণ হবে মনিরা।

কিন্তু কবে? কবে সেদিন আসবে আমার জীবনে বলতে পারো তুমি? কবে কোন্‌দিন আমরা দু'জন সুন্দর এক সংসার গড়ে তুলবো?

ধীরে ধীরে বনহুর আনমনা হয়ে যায়।

মনিরা বলে—কি ভাবছো?

ভাবছি কোনোদিন তোমার এ সাধ পূর্ণ হবে কি না তাই...

এমন সময় হঠাৎ মাঝিদের তীব্র চিৎকার শোনা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বজরাখানা দুলে উঠলো ভীষণভাবে।

মনিরা ব্যস্তকণ্ঠে বললো—সর্বনাশ, নিশ্চয়ই কোনো বিপদ ঘটেছে.........

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়ালো। ওদিকে টেবিলে দাড়ি-গোঁফ খুলে রেখেছিলো, সে দ্রুত হস্তে পরে নিলো, তারপর ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে গেলো।

দাড়ি-গোঁফ ঠিক মত করে নিতে বনহুরের সামান্য একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিলো, বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে দেখতে পেলো একদল ডাকাত লাঠিসোটা হাতে তাদের বজরায় হামলা চালিয়েছে। একবার বনহুর তাকিয়ে দেখে নিলো তার সরকার সাহেবকে আটক করে করে তার কাছে টাকাকড়ি চাইছে, পাশে নূর দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে মুখে বিস্ময় আর উত্তেজনার ছাপ।

মালেক মিয়াকে আসতে দেখে নূর চিৎকার করে বললো—মালেক চাচা ডাকাত......ডাকাত......।

মালেক মিয়া পিছন থেকে একজনকে চেপে ধরে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দেয় তার চোয়ালে। বলিষ্ঠ লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। অপর একজন ডাকাত মালেক মিয়াকে আক্রমণ করলে একটা বিরাট শক্ত লাঠি তুলে ধরলো সে মালেক মিয়ার মাথায়।

বিদ্যুৎ গতিতে মালেক মিয়া ফিরে দাঁড়ালো এবং ধরে ফেললো লাঠিখানা। ডাকাতটা কিছুতেই তার লাঠিখানা মালেক মিয়ার হাত থেকে কেড়ে নিতে সক্ষম হলো না।

মালেক মিয়া লাঠিখানা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো ডাকাতদলকে। এক এক আঘাতে এক একজন ডাকাত ঘায়েল হলো—কারও মাথা ফেটে রক্ত ঝরলো, কারও হাত ভাঙলো কারও পা ভাঙলো যে যেদিকে পারলো ইরামতির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাকাতদল বজরা থেকে উধাও হলো। মালেক মিয়াকে জড়িয়ে ধরলো নূর—মালেক চাচা, তুমি এতবড় শক্তিশালী! সত্যি, তুমি না থাকলে কি যে হতো মালেক চাচা......

সরকার সাহেবের কিন্তু দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে, তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মালেক মিয়ার দিকে। কি করে এ সম্ভব হলো? মালেক কি করে এতগুলো ডাকাতকে এক একটিমাত্র লাঠির দ্বারা কাবু করে ফেললো। হঠাৎ সরকার সাহেবের মুখমণ্ডল দীপ্তময় হলো, তিনি মৃদু হাসলেন।

ততক্ষণে নূর মালেককে জড়িয়ে ধরেছে—মালেক চাচা, তুমি যদি এ সময় না থাকতে তাহলে আমাদের কি অবস্থা হতো। ছুটে যায় সে মায়ের পাশে—আম্মি আম্মি, তুমি এখনও এ কামরায় বসে আছো! জানো আম্মি, মালেক চাচা একাই দশ বারো জন ডাকাতকে কাবু করে বিদায় করেছে.........

মনিরা কিন্তু কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব দেখছিলো, সে যখন দেখলো নূর তার কামরার দিকে আসছে তখন সে বিছানায় এসে বসেছিলো।

নূরের কথায় মনিরা অবাক কণ্ঠে বললো—সত্যি তোমার মালেক চাচা ডাকাত গুলোকে একাই কাবু করে ফেলেছিলো?

হাঁ আম্মি, তুমি যদি মালেক চাচার অসীম বীরত্ব দেখতে তাহলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে।

তাই তো, ভাগ্যিস্ তোমার মালেক চাচা বজরায় ছিলো। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য বলতে হবে......

এসো আম্মি, মালেক চাচার কাছে যাই।

চলো।

নূর আর মনিরা বেরিয়ে এলো কামরার ভিতর থেকে।

মালেক তখন মাঝিদের বলছে তাঁড়াতাড়ি বজরাখানাকে স্রোতের দিকে এগিয়ে নিতে। ঐ দিকে গেলে বজরাখানা আপনা আপনি স্রোতের টানে দ্রুত ভেসে চলবে। তখন ডাকাতদল তাদের বজরার আর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

মালেক মিয়া নিজে গিয়ে হাল ধরলো।

নূরের বিস্ময় যেন বাড়ছে, তার মালেক চাচার কত দক্ষতা।

অল্পক্ষণেই স্রোতের মুখে এসে পড়লো বজরাখানা। ভীষণ এক চক্র দিয়ে সা সা করে ছুটলো এবার মাঝিরা দ্রুতহস্তে দাঁড় তুলে বেঁধে ফেললো।

সরকার সাহেব বললেন—নূর ইনশাআল্লাহ আর কোনো ভয় নেই, বিপদ কেটে গেছে। চলো এবার ঘুমাবে চলো।

মনিরা বললো—হাঁ বাবা, যাও ঘুমাবে যাও। নিজে ও মনিরা কামরায় প্রবেশ করলো।

মনিরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেই বুঝতে পারে নি।

পাশের কামরায় সরকার সাহেব আর নূর অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

মালেক মিয়া নিজে হাল ধরে বসে আছে, কারণ এখানে পানির স্রোত এত বেশি যে মাঝিদের হাতে বজরার দায়িত্বভার ছেড়ে দেবার সাহস হয়নি। ঘন্টায় তাদের বজরা পাঁচ মাইল বেগে ভেসে চলেছে। তীরবেগে ছুটছে বজরা খানা।

এক সময় ভোর হয়ে এলো।

মালিক মিয়া বজরাখানাকে স্রোত ছেড়ে শান্ত নদীপথে নিয়ে এলো। এখন আর সেই ডাকাতদল বা অন্য কোনো দুষ্কৃতিকারী হামলা চালাতে সক্ষম হবে না। বিপদ কেটে গেছে, আর কোনো ভয় নেই। মালেক মিয়া মাঝিদের হাতে হাল ধরার দায়িত্বভার তুলে দিয়ে নেমে এলো বজরায়, আলগোছে সে প্রবেশ করলো মনিরার কামরায়।

পাশের জানালা দিয়ে ভোরের ঝিরঝিরে বাতাস এসে মনিরার এলোমেলো চুলগুলোকে আরও এলোমেলো করে দিচ্ছিলো। কয়েক গাছা চুল লুটোপুটি খাচ্ছিলো ওর কপালে।

বনহুর কামরায় প্রবেশ করে ধীর মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো শয্যার পাশে। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো সে মনিরার মুখের দিকে, তারপর ঝুঁকে পড়ে ছোটো একটি চুম্বনরেখা এঁকে দিলো ওর ঠোঁটে। ঘুম ভেঙে যায় মনিরার। ভীষণভাবে চমকে উঠে চোখ মেলতেই স্বামীর সুন্দর দীপ্ত মুখখানার উপর নজর পড়ে। চোখ রগড়ে বলে মনিরা—ভারি দুষ্টু তুমি!

বনহুর বসে পড়ে ওর পাশে। কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলে—আর দুষ্টামি করবো না প্রিয়া, এবার বিদায় চাই......

মনিরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে সে—না না, ও কথা বলো না।

কিন্তু হাজরা যে সে এসে গেছে?

তা আসুক......মনিরা স্বামীর জামার কিছু অংশ হাতের মুঠায় চেপে ধরে।

বনহুর বলে—ভোর হয়ে গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বজরা হীরাঝিলের অদূরে ইরামতি ঘাটে পৌঁছে যাবে। সেখানে ছদ্মবেশে অপেক্ষা করেছে গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের লোক, কাজেই আমাকে যেতে হবে এবার।

মনিরার দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এসে যায়, মলিন বিমর্ষ হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল, ব্যথাকাতর চোখে তাকায় সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বুঝতে পারে তাকে বিদায় জানাতে মনিরার কত কষ্ট হচ্ছে তবু তাকে যেতে হবে, না গিয়ে কোনো উপায় নেই। বনহুর মনিরার চিবুকটা তুলে ধরে বলে—রাগ করোনা লক্ষ্মীটি ঠিক আবার আসবো।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—এসো......

বনহুর ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দ্রুত দাঁড়ি-গোঁফ পরে নিলো তারপর ফিরে তাকালো মনিরার দিকে। মনিরার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রুধারা। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—খোদা হাফেজ!

বনহুর ততক্ষণে কামরার বাইরে বেরিয়ে গেছে। সরকার সাহেব আর নূর সবে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। মালেক মিয়া বললো—সরকার সাহেব, এখানে হাজরায় আমার বাড়ি, আমি নেমে যেতে চাই? কয়েকদিন দেশের বাড়িতে কাটিয়ে ফিরে যাবো মধুপুর গ্রামে।

সরকার সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—এখানেই নেমে যাবে তুমি?

হাঁ, অনেক দিন বাড়ি আসিনি কিনা।

নূর বললো—মালেক চাচা, তুমি কান্দাই আমাদের বাড়ি যাবেনা?

এবার নয়, এরপর আর একবার যাবো। নূর, চলি বাবা।

আচ্ছা, এসো মালেক চাচা।

বজরা হাজরা গ্রামের একটি ঘাটে এসে লাগলো।

মালেক মিয়া তার ছোট্ট পুঁটলিটা নিয়ে নেমে গেলো সেখানে।

নূর আর সরকার সাহেব হাত নাড়তে লাগলো। মালেকের চোখ দুটো চলে গেলো বজরার পাশের জানালায়, সে দেখলো অশ্রু ছলছল দুটি চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বজরাখানা যতক্ষণ দেখা গেলো মালেক মিয়া একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

বজরার কিনারে দাঁড়িয়ে আছে নূর আর সরকার সাহেব। ধীরে ধীরে দূরে অনেক দূরে চলে গেলো বজরাখানা। তখনও মালেক মিয়া তাকিয়ে আছে সেদিকে।

হঠাৎ কে যেন কথা বললো—ওরা তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গেলো কেন?

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর, দেখলো একটি গ্রাম্য বধু কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—ওরা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেলো, সঙ্গে নিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে তাই।

তোমার কেউ নেই বুঝি?

না, হাজরায় আমার কেউ নেই।

তবে কোথায় যাবে?

জানি না।

তুমি জানো কোথায় যাবে?

না?

বুড়ো মানুষ, আহা বড় কষ্ট হবে তোমার! ওরা বড় নিষ্ঠুর তাই তোমাকে ওরা নামিয়ে দিলো। শোন, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

নিয়ে যাবে আমাকে?

হাঁ কিন্তু......বধূর মুখখানা ম্লান হয়ে আসে। একটু ভেবে বলে—আমার শ্বশুর খুব রাগী মানুষ, তাই ভাবছি......

কিছু ভাবতে হবে না, আমি তাকে ঠিক করে নেবো। আপাতত একটু আশ্রয় আমার প্রয়োজন।

বেশ, চলো তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। একটু দাঁড়াও, কলসীটায় পানি ভরে আনি।

তুমি আমাকে কলসী দাও, আমি পানি ভরে আনছি। বললো মালেকবেশী বনহুর।

বধু বললো—তুমি বুড়ো মানুষ, পারবে না। আমার অভ্যাস আছে, রোজ ঘাট থেকে পানি আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

মালেক মিয়া বলে উঠলো—রোজ তুমি পানি বয়ে নিয়ে যাও, আজ না হয় আমিই বইলাম। দাও, কলসীটা আমাকে দাও।

বধু কলসীটা মালেক মিয়ার হাতে দিলো।

মালেক মিয়া কলসীটা নদী থেকে ভরে নিয়ে ফিরে এলো, তারপর বললো—চলো।

বধু ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। দু'পাশে ধান আর গমের ক্ষেত। সোনালী ফসলে চারদিকে যেন সোনা ছড়িয়ে আছে। আলপথ ধরে এগুচ্ছে ওরা।

ভোরের বাতাসে ধান আর গমশিষগুলো দুলে দুলে যেন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে।

পাশ কেটে চলে গেলো দু'একজন চাষী, তারা লাঙ্গল যোয়াল কাঁদে নিয়ে মাঠে যাচ্ছে জমি চাষ করতে। গরুগুলোকে সাবধানে ওরা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো যেন পাকা ধানে মুখ না লাগায়।

এগিয়ে এলো কয়েকজন পল্লীবধু, তাদের কাঁখেও কলসী। মালেক মিয়া আর বধুটিকে দেখে ওরা থেমে পড়লো অবাক কণ্ঠে বললো একজন—হাবলুর বৌ তোমার সঙ্গে ওটা কে?

বধু বললো—নদীর ঘাটে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি। এ গ্রামে ওর কেউ নেই কিনা তাই নিয়ে যাচ্ছি......

বধুর দল কেমন যেন চিন্তিত হলো।

একজন বধূ বললো—নিয়ে তো যাচ্ছো কিন্তু তোমার শ্বশুর যা মানুষ, ওকে যেতে দেবে কি?

আর একজন বললো—আছে অনেক কিন্তু একটা চাকর পর্যন্ত রাখবে না ঘরে, যা হাড় কিপ্‌টে মানুষ।

পাশ কেটে চলে গেলো ওরা।

হাবলুর বৌ আবার অগ্রসর হলো।

মালেক মিয়া কলসী কাঁধে তাকে অনুসরণ করলো।

আর কিছুটা এগুতেই নজরে পড়লো কিছুদূরে একটি বিরাট বাড়ির চালা।

হাবলুর বৌ ঘোমটা ঠিকমত মাথায় টেনে দিয়ে বললো—ঐ যে দেখা যাচ্ছে, ওটা আমার শ্বশুরবাড়ি।

মালেক মিয়া বললো—তোমার শ্বশুর বুঝি খুব বড়লোক?

হাঁ খুব বড়লোক মানে অনেক টাকা পয়সা আছে আমার শ্বশুরের। অনেক ধনদৌলত আছে কিন্তু.........

থামলে কেন?

কিন্তু বড় কৃপণ হাড়কিপ্‌টে তা ছাড়া আরও কিছু আছে যা কার কাছে বলা যায় না।

মালেক মিয়ার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, বললো সে— কি এমন কথা যা বলা যায় না? আমি বুড়ো মানুষ, তা ছাড়া বিদেশী, আমাকে বললে কিছু হবে না। আমি তো আর কাউকে বলবো না।

তা ঠিক, তুমি আর কাকে বলতে যাবে, এ গ্রামে তোমার তো আর কেউ নেই।

না, আমার কেউ নেই, কোনো কথা আমি কাউকে বলবো না।

হাবলুর বৌ বললো—আমার শ্বশুর শত গ্রামের প্রধান, তা ছাড়া সরকারের লোকের সঙ্গে তার খুব খাতির আছে।

সে তো খুব ভাল কথা।

হাঁ, সরকারের লোক মাঝে মাঝে গ্রামে আসে, আমার শ্বশুরের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা হয়। তারপর ট্রাক বোঝাই হয়ে জিনিসপত্র আসে, সেই সব জিনিস ট্রাকের ড্রাইভার লোক জন দিয়ে নামিয়ে দিয়ে যায়।

তারপর?

ঘরভর্তি হয়ে যায় জিনিস দিয়ে। শ্বশুর তালাবদ্ধ করে রাখেন, তারপর আবার ট্রাক আসে লোকও আসে ট্রাকের সঙ্গে। বৈঠকখানা ঘরে বসে চাপাগলায় কি সব কথা-বার্তা হয় তাদের মধ্যে, তারপর অনেক রাতে মালগুলো আবার ট্রাকভর্তি হয় এবং কোথায় চলে যায় কে জানে। শ্বশুর সবাইকে বলে দিয়েছে, বাড়ির এ সব কথা যেন কেউ কাউকে না বলে দেয়।

ঠিক কথাই বলেছেন তোমার শ্বশুর সাহেব, বাড়ির কথা কাউকে বলতে নেই! আমি বুড়ো মানুষ, তা হাজরা গ্রামে আমার কেইবা আছে।

হাঁ, তাইতো তোমাকে এসব কথা বললাম। তুমি তো বলবে না জানি। দেখো তোমাকে দেখলে ঠিক আমার দাদুর কথা মনে হয়। আমার দাদু খুব ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি সাত গাঁয়ের মাতবর ছিলেন না, বটে, তবু সাত গাঁয়ের মানুষ তাকে ভালবাসতো। আমার দাদু গ্রামের লোকদের উপকার করতো। নিজের যা কিছু থাকতো তাই দিয়ে গরিব মানুষদের বাঁচাতো। একবার দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো, গ্রামের মানুষ না খেয়ে মরছে। চারিদিকে হাহাকার, দাদু গ্রামের মানুষের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পাশের গ্রাম হাজারা মাতব্বর এখন যিনি আমার শ্বশুর তার কাছে কিছু টাকা কর্জ করে নিয়ে গিয়ে গ্রামের লোকদের দিয়েছিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো হাবলুর বৌ, তারপর আবার বলতে শুরু করলো—সেই ঋণ দাদু শোধ করতে না পেরে পা পর্যন্ত ধরে ছিলেন হাজরার মাতব্বরের কিন্তু তিনি সেই টাকা মাফ করেননি। টাকার পরিবর্তে হাজরার মাতব্বর তার পাগল ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দাদু অসহায়, কাজেই অমত করতে পারেন নি...

বলো কি, তোমার স্বামী পাগল?

মালেক মিয়ার কথায় চোক দুটো ছলছল করে উঠে হাবলুর বৌয়ের, চাপা গলায় বলে—হাঁ! শুধু পাগল নয়, সে বোবা......বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে তার কণ্ঠ।

মালেক মিয়া চলতে চলতে থেমে গিয়েছিলো। ফিরে তাকালো সে হাবলুর বৌয়ের দিকে। গ্রাম্য বধু হলেও হাবলুর বৌয়ের সৌন্দর্য কম ছিলো না। কাজল কালো ডাগর-ডাগর দুটি চোখ, একজোড়া সুন্দর ভ্রু উন্নত নাসিকা ফিকা গোলাপী দুটি ওষ্ঠদ্বয়। দেহের কানায় কানায় যৌবন যেন তার উছলে পড়ছে। সাধারণ অল্প পয়সার শাড়িখানা যেন তার রূপরাশিকে আরও অপরূপ করে তুলেছে। অস্ফুট কণ্ঠে বললো মালেক মিয়া—সামান্য ক'টা টাকার বিনিময়ে তোমাকে তোমার দাদু একটা বদ্ধ পাগলের হাতে সঁপে দিয়েছিলো, বলো কি?

এ ছাড়া দাদুর কোনো উপায় ছিলো না।

মালেক মিয়া চলতে শুরু করলো।

নীরবে এগুচ্ছে ওরা দু'জন।

মালেক মিয়া ভাবছে হাবলুর বৌয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এই মেয়েটির জীবন কি সত্যি ব্যর্থ হয়ে যাবে? এমন সুন্দর একটি জীবন.......কিন্তু এখন বেশি ভাববার সময় নেই, প্রায় তারা বিরাট বাড়িখানার সন্নিকটে পৌছে গেছে। এবার মালেক মিয়া বললো—তোমার শ্বশুর সাহেবের নামটাতো বললে না বাছা, তার নাম কি?

শ্বশুরের নাম ধরতে নেই তা বুঝি জানোনা? চলো তার নাম আপনা আপনি জানতে পারবে।

মালেক মিয়া বুঝতে পারলো বধু কিছুতেই শ্বশুরের নাম মুখে আনবে না, কাজেই বধূর মুখে শ্বশুরের নাম শোনার আশা ত্যাগ করলো সে।

বিরাট বাড়িখানার উঁচু প্রাঙ্গণ। একটা বড় গাছের ছায়ায় চেয়ার নিয়ে বসে আছে একটি ভুড়িওয়ালা লোক। মুখে একমুখ চাপদাড়ি। মাথায় তেল চকচকে বাব্‌রী চুল, তার উপরে তাল আঁশের টুপি। চোখে সুরমা, পানের

রসে দাঁতগুলো লাল টকটকে। পরনে পাজামা, গায়ে মাতব্বর লোকদের মত শেরোয়ানী।

মালেক মিয়া একনজর দেখে নিলো হাবলুর বৌয়ের শ্বশুর সাহেবকে।

শ্বশুর সাহেব তামাক সেবন করছিলেন। হঠাৎ বৌমা ও তার সঙ্গীটির উপর নজর পড়ে, হুঁকোটা রেখে উঠে দাঁড়ালেন, দু'চোখে বিস্ময় আর ক্রুদ্ধ ভাব নিয়ে বললেন—তোমার সঙ্গে ও লোকটা কে? এর পূর্বে তো ওকে কোনো দিন দেখিনি? কথা বলার সঙ্গে ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠে ছিলো তার।

হাবলুর বৌ ভয়কম্পিত কণ্ঠে বললো—এর কেউ নেই তাই...

তাই ওকে দরদ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছো?

হাঁ বাবা, ও আমাদের বাড়িতে কাজ করতে চায়, বড় ভাল মানুষ। আমাকে পানির কলসীটা বয়ে আনতে দিলো না।

হয়েছে থামো। নিজের বাড়ির মানুষকেই খাওয়াতে পারছি না, আবার কাজের লোক! কি কাজ আছে আমার বাড়িতে? গরু আছে মাত্র দুই কুড়ি—তার গোবর তোলা, খড় খাওয়ানো, গোয়েলে গরু তোলা— এসব তো হাবলুই করে, তবে মাঝে মাঝে যা দু'চার দিন তোমাকে করতে হয়। অবশ্য ওর যখন মতলব ঠিক থাকে না তখন। লোক দিয়ে কি হবে শুনি, একরাশ ভাত গিলবে তারপর আবার মাইনে চাইবে।

এবার বলে উঠে মালেক মিয়া—মাইনে লাগবে না, শুধু চারটি খেতে দেবেন।

হাবলুর বৌ বলে—দেখেছেন বাবা, ও মাইনে নেবে না বড় ভাল মানুষ। চারটি খাবে আর কাজ করবে।

চশমার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আবার মাতব্বর সাহেব। মালেক মিয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলেন—বুড়ো হয়েছো, পারবে তো কাজ করতে?

পারবো।

তবে যাও, কিন্তু মনে রেখো কিছু যেন চুরি করো না। যদি চুরি করেছো তো মরেছো। সব সময় আমার বাড়িতে পুলিশের লোক আসা-যাওয়া করে। আমি নিজেও কম নই, আমার নাম ইকরাম আলী মিয়া।

মালেক মিয়া আপন মনে নামটা একবার উচ্চারণ করে নিলো—ইকরাম আলী মিয়া......

হাবলুর বৌ বললো—এসো।

মালেক মিয়া তাকে অনুসরণ করলো।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেই খেঁকিয়ে উঠলো এক নারীমূর্তি। নারীমূর্তি নয়, যেন একটি হস্তিনী, বিশাল বপু নিয়ে এলো। মুখে তার এক গাল পান, আংগুলের ডগায় চুন, ঝঙ্কার দিয়ে বললো—সঙ্গে ওটা কে? নিজে পারো না আর একজনকে দিয়ে পানি বয়ে এনেছো, বলি পয়সা টয়সা নেবে না তো?

হাবলুর বৌ ঢোক গিলে বললো—লোকটা বড় ভাল, ও আমাদের বাড়িতে কাজ করবে কোনো পয়সা নেবে না। শুধু চারটি খাবে এই যা।

বুঝেছি নিজের আরাম আয়েশের জন্যই ওকে ধরে এনেছো। তা হবে না, রোজ তোমাকে ঘাট থেকে পানি আনতেই হবে। তারপর মালেক মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে ইকরাম গৃহিনী—যাও, পানির কলসী ওখানে নামিয়ে রাখো। তোমাকে কোন্ কোন্ কাজ করতে হবে আমিই তা দেখিয়ে দিবো। এসো আমার সঙ্গে।

বিশাল বপু নিয়ে এগুলেন ইকরাম গৃহিনী,যেন একটি হস্তিনী এগিয়ে চলেছে। তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে মালেক মিয়া।

হাবলুর বৌ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

চলতে চলতে পিছন ফিরে বললো ইকরাম গৃহিনী—বৌ, তোমার যা কাজ তুমি করোগে, আমি ওকে গোয়াল বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে আসি। আজ হাবলুর শরীর ভাল নেই।

মালেক মিয়া এবার বুঝতে পারলো তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোয়ালবাড়িতে গোয়ালঘরগুলো পরিস্কার করার জন্য। মনে মনে প্রমাদ গুণলেও ঘাবড়ালোনা মালেক মিয়া।

গোয়ালে এসে মালেক মিয়ার চক্ষুস্থির। প্রায় চল্লিশটি গরু বাধা আছে সারিবদ্ধভাবে। স্তূপাকার গোবর আর খড়-কুটো। অনেক দিন অনেক কাজ করেছে মালেক মিয়া কিন্তু এমন কাজ তার ভাগ্যে জোটেনি এখনও। আজ সাত সকালে তার ভাগ্যে এই কাজ ছিলো.........

চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ইকরাম গৃহিনীর কথায়, তিনি বলছেন—দেখো এসেছো যখন তখন ভাল করে কাজকর্ম করবে, নাহলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো। এই যে গোয়ালঘর দেখছো, সব পরিস্কার করে গোয়াল থেকে গরুগুলো উঠানে খুঁটিতে বাঁধবে, তারপর খড়ের পালা থেকে খড় খুলে খেতে দেবে, তারপর তুমি খেতে পাবে।

মালেক মিয়া শুধু ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালো।

ইকরাম গৃহিনী চলে গেলেন অন্তঃপুরে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মালেক মিয়া কিন্তু এত বড় গোয়াল বাড়ি সে কি করে পরিস্কার করবে! এর চেয়ে তাকে মাটি কাটার কাজ দিলেও সে পুকুর খনন করতে পারতো। কিন্তু ভেবে তো আর কোনো উপায় হবে না, বিশালদেহী ইকরাম গৃহিনী এক্ষুণি এসে হাজির হবে।

মালেক মিয়া গোয়াল পরিস্কারে মনোনিবেশ করলো। কোদাল দিয়ে ঝুড়িতে গোবর তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে লাগলো সে। সমস্ত দেহ ওর ঘামে ভিজে চুপসে উঠলো। প্রায় ঘন্টা দুই লেগে গেলো গোয়াল বাড়ি পরিস্কার করতে। এবার সে গরুগুলো উঠানে বাঁধতে গেলো, অমনি একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এলো মালেক মিয়ার। ফিরে তাকিয়ে দেখে একটা এবড়ো থেবড়ো লোক এগিয়ে আসছে তার দিকে। পরনে লুঙ্গি কাঁধে গামছা লুঙ্গিটা একপাশে কিছু গুঁজে রেখেছে তাতে ওর হাঁটু পর্যন্ত নজরে আসছে। কেমন যেন একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছে, মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। লোকটা গোঙানির মত অদ্ভুত শব্দ করে তাকে কি যেন সব বলছে।

মালেক মিয়া তখন শেষ গরুটা এনে খুঁটিতে বাঁধতে যাবে, ও এসে দড়ি সহ হাত চেপে ধরলো, তারপর বিকট শব্দে চিৎকার করতে লাগলো।

মালেক মিয়া তো অবাক, সে দড়ি সহ গরুটা ছেড়ে দিলো।

ততক্ষণে বিশাল বপু নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন ইকরাম গৃহিনী? তিনি বলে উঠেন—হাবলু বাপ আমার সরে আয়। তোর শরীর খারাপ, আজ থেকে ঐ লোকই গোয়াল পরিস্কার করবে।

জননীর কোমল বাক্য কানে গেলো কিনা হাবলুর বোঝা গেলো না তবে মা ইশারায় বুঝিয়ে দিলো আজ থেকে তাকে আর গোয়াল পরিস্কার করতে হবে না। হাবলু মায়ের কথা বুঝলো, তারপর শান্ত হয়ে এ্যাঁ এ্যাঁ একটা অদ্ভুত শব্দ করতে করতে চলে গেলো।

মালেক মিয়া বুঝতে পারলো ঐ লোকটা অন্য কেউ নয়, হাবলু। এ্যাঁ এ্যাঁ শব্দটা তার খুশি হবার আয়োজন। হাবলু ভীষণ রেগে গিয়েছিলো তখন সে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করছিলো। মালেক মিয়া ভাবছে ঐ বধুটির স্বামী দেবতাই হলো ঐ হাবাচাঁদ হাবলু মিয়া। হায় অদৃষ্ট বধুটির পাশে ওকে চিন্তা করা মানে আকাশ আর পাতাল যেমন নরক আর স্বর্গ......আপন মনে হাসলো মালেক মিয়া, ব্যথাকরুণ সে হাসি।

সমস্ত দিন পরিশ্রম করে শরীরটা মালেক মিয়ার ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। বিছানায় দেহটা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে জড়িয়ে এসেছিলো তার চোখ দুটো। হঠাৎ মোটরের আওয়াজ কানে যেতেই চোখ মেললো সে কিন্তু ঘরখানা জমাট অন্ধকারে ভরা থাকায় ঘরের ভিতরে কিছু নজরে পড়লো না। ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। যে ঘরখানায় মালেক মিয়াকে থাকতে দেওয়া হয়েছিলো সেই ঘরখানার পিছনে একটি ছোট্ট জানালা ছিলো, ঐ জানালাপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মালেক মিয়া বাইরের দিকে।

প্রথম নজরেই পড়লো লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ইকরাম আলী মিয়া। লণ্ঠনটা তিনি বাম হস্তে উঁচু করে রেখে ডান হস্তের আংগুলে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। বৈঠখানা ঘরের সম্মুখে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকখানা তখনও ত্রিপলে ঢাকা রয়েছে।

দু'জন লোক ট্রাকের উপরে বসে ত্রিপলের বাঁধন খুলে দিচ্ছে। দু'জন দাঁড়িয়ে আছে নিচে, তারা প্রতীক্ষা করছে মালগুলো নামিয়ে নেবে এবং এ কারণেই তারা অপেক্ষা করছে উদগ্রীব হয়ে।

মালেক মিয়ার চোখ দুটিতে শুধু বিস্ময় নয়, বিপুল জানার বাসনা—ওতে কি আছে, কি মাল নামানো হবে এবং মালগুলো কোথা থেকে এসেছে। স্তব্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো সে।

ত্রিপল খুলে ফেলা হলো, দেখা গেলো এক একটা প্যাকেট রয়েছে, প্যাকেটগুলি বেশ বড় এবং তার এক একটি যে ভীষণ ভার তা নামানো কালেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

মালগুলো নামানোর সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু যারা বৈঠকখানায় মাল বা বিরাট আকার প্যাকেট নিয়ে প্রবেশ করছে তারা চটপট বেরিয়ে আসছে না, বেশ সময় নিচ্ছে মালগুলো ভিতরে রেখে ফিরে আসতে।

প্রায় ঘন্টাখানেক লাগলো মালগুলো নামিয়ে রাখা শেষ হতে।

মালেক মিয়া দেখলো মাল নামানো শেষ হলে ইকরাম আলী মিয়া একটা কাগজে বোধ হয় কিছু লিখে নাম সহি করলো তারপর, কাগজটা ট্রাকের পাশে দাঁড়ানো একটি লোককে দিলেন।

লোকটা কাগজখানা লণ্ঠনের সম্মুখে নিয়ে দেখলো, তারপর ভাঁজ করে পকেটে রাখলো। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিতেই লোকটা উঠে বসলো ড্রাইভ আসনের পাশে।

গাড়ি চলে গেলো।

ইকরাম আলী মিয়া লণ্ঠন হাতে প্রবেশ করলো অন্তঃপুরে।

মালেক মিয়া ভাবতে লাগলো, হাবলুর বৌ বলেছিলো তার শ্বশুরের সঙ্গে সরকারের লোকের যোগাযোগ আছে, গাড়ি আসে, গাড়িভর্তি মাল আসে। সে সব মাল আবার কোথায় চলে যায় কেউ জানে না। বাড়ির সবাই সাবধান আছে, এ কথা কাউকে তারা বলে না, বললে বিপদ আছে জানে তারা। এ সব গাড়ি রাতের অন্ধকার আসে, আবার রাতের অন্ধকারেই চলে

যায়। গ্রামের মানুষ বুঝতেই পারে না, আর পারলেই বা কি, কারও কোনো কথা বলার উপায় নেই।

গ্রামের মানুষ গভীর রাতে গাড়ির শব্দ শুনতে পায়। ভোরে সবাই মোটরের চাকার দাগ লক্ষ্য করে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। তারা জানে—বুঝে সব তবু নীরব থাকে, কারণ ইকরাম আলী সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে সাহসী নয় তারা।

মালেক মিয়া শয্যা গ্রহণ করে কিন্তু চোখে তার ঘুম আসে না। ইকরাম আলী মিয়ার কাজ তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। নিশ্চয়ই এমন কোনো জিনিস গাড়িতে এসেছে যা দিনের আলোতে প্রকাশ্যভাবে করা যায় না।

পর দিন ঘুম ভাঙতে একটু দেরী হয়ে গেছে, ইকরাম আলী মিয়ার কর্কশ কণ্ঠের আহ্বানে ঘুম ভেঙ্গে যায় মালেক মিয়ার। সে ধড় মড় উঠে বসে চোখ রগড়াতে শুরু করে। সমস্ত রাত তার ঘুম হয়নি, প্রথম রাতেই যা ঘুমিয়ে নিয়েছিলো সে। চোখ দুটো জ্বালা করছে তার। আরও কিছু ঘুমাতে পারলে শরীরটা অনেকখানি হাল্কা মনে হতো।

কিন্তু ঘুমাবার উপায় নেই, ইকরাম আলী মিয়া যা বক বক শুরু করেছেন—এত বেলা ধরে ঘুমালে কাজ হবে কখন? বৌয়ের কাজ ছিলো না, তাই সে ওকে সঙ্গে এনেছে, যত আলসে অপদার্থ ইত্যাদি নানা কথা।

মালেক মিয়া বেরিয়ে আসতেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—ইকরাম আলী মিয়া বুড়ো হয়েছো তবু আক্কেল হয়নি? দুপুর বেলা গোয়াল থেকে গরু বের করবে নাকি। গোয়াল পরিষ্কার করবে কখন? আজ জমিতে লাঙ্গল নিতে যেতে হবে। এক নিঃশ্বাসে বললেন ইকরাম আলী মিয়া কথাগুলো।

মালেক মিয়া কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলো গোয়ালের দিকে। কাল থেকে আর একটিবার হাবলু বৌয়ের উপর তার নজর পড়েনি। বেচারী হাবলুর বৌ, ওর মুখখানা মনে পড়তেই মালেক মিয়ার বুকটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো। নিজের অজ্ঞাতে চোখ দুটো তার চলে গেলো অন্তঃপুরের দিকে।

হঠাৎ মালেকের কানে এলো, ভিতর বাড়ি থেকে ভেসে আসছে ইকরাম গৃহিনীর গলার কঠিন কণ্ঠস্বর—এতোক্ষণ ঘাটে পানি আনতে যাওনি রান্নাবান্নার সময় হলে তখন তুমি ঘাটে যাবে। ও হবে না, আজও ভাবছো ঐ বুড়ো তোমাকে ঘাট থেকে পানি বয়ে এনে দেবে। ওকে আজ লাঙ্গল নিয়ে জমিতে পাঠানো হচ্ছে। শুধু গোয়াল পরিস্কার করলেই ভাত পাওয়া যায় না। যতসব ঝঞ্ঝাট বয়ে এনেছে ঘরে। যাও কলসী নিয়ে ঘাটে পানি আনতে যাও, দশ কলসী পানি আনতে সময় লাগবে দশ ঘণ্টা, আজ তা হবে না বলে দিচ্ছি.........

মালেক মিয়া এরপর আর দাঁড়ালো না, সে চলে গেলো নিজের কাজে।

গোয়াল পরিস্কার করবে বলে যেমন সে গরুর দড়িতে হাত দিয়েছে অমনি কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো হাবলু। রাগে সে ফোঁস ফোঁস করছে, এক ঝটকায় মালেক মিয়ার হাত থেকে গরুর দড়ি কেড়ে নিয়ে দিলো এক ধাক্কা।

মালেক মিয়ার রাগ হলো, সেও এক ধাক্কা দিলো ওকে। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো হাবলু চাঁদ। তারপর গোঁ গোঁ করে কিছু গালমন্দ করতে লাগলো। মালেক মিয়া ভাবলো এখন যদি ওর স্নেহময়ী জননীর আর্বিভাব ঘটে তা হলে ভিষণ বিপদের সম্ভাবনা আছে, কাজেই মালেক মিয়া ওর হাত ধরে ওকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দড়িটা গুঁজে দিলো ওর হাতে, তারপর ইশারা করে দেখালো ওদিকের পিয়ারা গাছটা।

গাছে অনেকগুলো পাকা পিয়ারা দুলছে। হাবলু চাঁদের পেয়ারা গাছে নজর পড়তেই চুপ হয়ে গেলো। কাল মালেক মিয়া লক্ষ্য করেছিলো। হাবলু পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা পাড়ার জন্য উঠেপড়ে চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই পেয়ারা পাড়তে পারছে না।

আজ মালেক মিয়া পেয়ারা গাছের দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেই হাবলু চুপ হয়ে গেলো। ইশারা করলো সে মালেক মিয়াকে পেয়ারা পেড়ে দেবার জন্য।

মালেক মিয়া বললো—দাঁড়াও আগে গোয়াল পরিস্কার করে নেই তখন পেয়ারা পেড়ে দেবো।

হাবলু মালেক মিয়াকে গরু বের করায় সাহায্য করতে লাগলো। মালেক মিয়া গোয়াল ঘর পরিস্কারে লেগে গেলো।

এমন সময় নজরে পড়লো কলসী কাঁখে হাবলুর বৌ বেরিয়ে গেলো। মালেক মিয়া তখন কোদালে গোবর তুলছিলো, তার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো মালেক মিয়ার। বড় অসহায় করুণ লাগলো হাবলুর বৌকে।

হাবলুর বৌ চলে যেতেই ফিরে তাকালো মালেক মিয়া হাবলুর দিকে। হাবলু বৌকে দেখে দাঁত বের করে হাসছে। বিশ্রী কুৎসিত সে হাসি। দাঁতগুলো যেন শেওলা ধরা কোদাল। মালেক মিয়ার শরীরে যেন জ্বালা ধরে গেলো ও হাসি দেখে, তবু নীরব রইলো কোনো কথা না বলে।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে লাঙ্গল কাঁধে ছুটলো মালেক মিয়া জমি চাষ করতে। উদ্দেশ্য তার হাবলুর বৌয়ের সঙ্গে নদীতীরে কিছু কথা বলা।

গরু আর লাঙ্গল রেখে এগিয়ে গেলো মালেক মিয়া। কলসী কাঁখে তীরে এসে দাঁড়িয়েছে হাবলুর বৌ, ঠিক ঐ সময় মালেক মিয়া এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

হাবলুর বৌ ওকে দেখে খুশি হয়ে বলে—এসেছো এখানে? দেখো তোমার কষ্ট দেখে আমার বড় দুঃখ হয় কিন্তু কি করবো আমার শ্বশুর-শাশুড়ী বড় নির্দয়। তুমি বুড়ো মানুষ তবু তোমাকে কেমন খাটিয়ে নেয়।

মালেক মিয়া হেসে বলে—তাতে দুঃখ করার কিছু নেই। কাজ, ও আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমার দুঃখ হয় তোমার জন্য।

হাবলুর বৌ হাসে, ম্লান করুণ সে হাসি। তারপর বলে—আমার জন্য কেন দুঃখ হয় তোমার?

জানিনা, তবু দুঃখ হয়।

তুমি আমার দাদুর মত কিনা তাই আমার জন্য এত ভাবছো। শুনলাম তোমার নাম মালেক মিয়া কিন্তু আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকবো না, তোমাকে আমি দাদু বলে ডাকবো।

বেশ, তাই ডেকো।

কিন্তু সবার সামনে মালেক ভাই বলবো, কেমন?

মন্দ নয়, তাই বলো। দাও এবার কলসীটা আমাকে দাও, আমি বাড়ির কাছাকাছি তোমাকে পৌছে দিয়ে আসবো। দশ কলসী পানি মাত্র এক ঘন্টায় আমি তোমায় দিয়ে আসবো। তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে আমি.........

না, তা হয় না। বুড়ো মানুষ তোমার কষ্ট হবে না বুঝি?

তা হোক আমার কাজ করে অভ্যাস আছে।

আমারও আছে।

তবু তুমি মেয়েমানুষ কাজেই.......দাও কলসী আমাকে দাও।

মালেক মিয়া হাবলুর বৌয়ের হাত থেকে কলসী নিয়ে নেয়। তারপর চলতে চলতে বলে—আচ্ছা, তোমার নাম কি তা তো বললে না?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে হাবলুর বৌ—আমার নাম দাদুই রেখেছিলেন গোলাপী। ছোটবেলায় নাকি গোলাপ ফুলের মত সুন্দর ছিলাম, তাই......

মালেক মিয়া তাকালো ওর মুখের দিকে। মিথ্যা বলেনি, সত্যি হাবলুর বৌ গোলাপের মতই সুন্দর।

কি দেখছো মালেক ভাই?

না কিছু না, চলো।

চলতে চলতে বলে মালেক মিয়া—আমি কিন্তু তোমাকে গোলাপী বলেই ডাকবো।

বেশ, তাই হবে। আমাকে তুমি গোলাপী বলেই ডেকো মালেক ভাই।

আবার পথ চলতে লাগলো ওরা।

বললো মালেক মিয়া—আচ্ছা গোলাপী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, বলবে?

বলবো বলো?

আচ্ছা, কাল রাতে মোটর গাড়ি এসেছিলো কেন? ওতে কি এসেছিলো বলতে পারো?

গোলাপী এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—অনেক রাতে গাড়ি এসেছিলো জানি কিন্তু গাড়িতে কি এসেছিলো তা জানি না।

ও, তোমাকে বুঝি তোমার শ্বশুর কিছু বলে না?

না। আমাকে তো বলেনই না, কাউকে না। আচ্ছা মালেক ভাই।

বলো?

তোমাকে ওরা যা খেতে দেয় তাতে তোমার পেট ভরে না, তাই না? সত্যি করে বলবে কিন্তু?

হঠাৎ মালেক মিয়ার চিন্তাধারা অন্যদিকে মোড় ফিরে, বলে—তাতে কি এসে যায়! চিরদিন পেটভর্তি করে খেয়েছি, দু'চার দিন না হয় একটু কমই খেলাম।

মালেক ভাই, রাতে যখন তোমাকে খেতে দিলো তখন আড়াল থেকে আমি সব লক্ষ্য করেছি। দিনের ঠাণ্ডা ভাত, তবু শুধু ডাল আর শাকভাজি—তুমি চারটি মাত্র মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখলে। তখন আমার যা দুঃখ হলো কিন্তু কি করবো......একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলো গোলাপী।

❑

সমস্ত দিনটা কেটে গেলো।

মালেক মিয়ার সঙ্গে আর দেখা হয়নি গোলাপীর। রাতে বাড়ির ছোট্ট চাকরটা যখন ভাত নিয়ে এলো তখন মালেক মিয়া বসেছিলো জানালার পাশে মুক্ত বাতাসে। ভাবছিলো সে মনিরা আর নূরের কথা। ওরা নিশ্চয়ই শহরে ভালভাবে পৌঁছে গেছে। সরকার সাহেব সঙ্গে আছেন, কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নেই। নূর হয়তো মনিরাকে বারবার প্রশ্ন করছে তার আব্বু কবে আসবে। তিনি হঠাৎ এভাবে চলে গেলেন কেন...এমনি কত কি! নূরের কাছে মনিরাকে অনেক সময় নানারকম মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে।

আজ দু'দিন দু'রাত গত হয়ে গেছে, সে ফিরে যেতে পারতো কান্দাই আস্তানায় কিন্তু যাওয়া তার হলো না। একটা অন্যায় অনাচারের সন্ধান সে পেয়েছে, তাই ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করতে পারেনি। তাকে এর সমাধান করে তবেই ফিরে যেতে হবে......

হঠাৎ চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, চাকর ছোকরা বলে উঠে—এই বুড়ো, তোমার ভাত-ডাল রইলো, খেয়ে নিও। ভাতের থালা আর ডালের বাটি রেখে চলে গেলো সে।

মালেক মিয়া মুক্ত জানালার পাশ থেকে উঠে এলো ভাতের থালার পাশে। কিন্তু ভাতে হাত দিয়েই আঁতকে উঠলো, সকালের ভাত হয়তো, একেবারে পচে গলে গেছে। মালেক মিয়ার বড় ক্ষুধা পেয়েছিলো কিন্তু খাওয়া আর হলো না, ভাতের থালা সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়তেই কে যেন বললো—জানি, ও ভাত তুমি খেতে পারবে না।

কে?

আমি গোলাপী।

তুমি!

হাঁ মালেক ভাই, আমি......সামনে এসে দাঁড়ায় গোলাপী, আঁচলের তলা থেকে বের করে আনে একথালা ভাত আর কিছু তরকারি। থালা সহ ভাত মালেকের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে—তুমি খাও মালেক ভাই।

তারপর দ্রুত পচা ভাতের থালাটা তুলে নিয়ে আঁচলে ঢেকে বেরিয়ে যায় গোলাপী।

মালেক মিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর থালাটার দিকে ফিরে তাকায়, কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ওর মন

পরদিন।

মালেক মিয়া গোয়ালে কাজ করছে, এমন সময় ইকরাম আলীর কাছে দু'জন লোক এলো। শহর থেকে এসেছে তাদের চেহারা দেখেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

ইকরাম আলী তাদের বৈঠখানা ঘরে নিয়ে বসলেন। মালেককে ডাকলেন তামাক দেবার জন্য।

মালেক মিয়া সুযোগ খুঁজছিলো, দরবড় হাতের কাজ রেখে ছুটে এলো—মালিক, আমাকে ডাকছেন?

হাঁ, তামাক নিয়ে আয়।

মালেক মিয়া চলে যায় এবং তামাক সাজিয়ে কলকেসহ হুঁকোটা নিয়ে আসে।

ততক্ষণে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে ইকরাম আলী ও তার সঙ্গীদ্বয়ের মধ্যে।

মালেক মিয়া আসায় চুপ হয়ে গেলেন তাঁরা। ইকরাম আলী বললেন—ও আমাদের কথাবার্তা বুঝতে পারবে না, বড় বোকা লোক। তা ছাড়া নতুন এসেছে, আমাদের বাড়ির সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই।

মালেক মিয়া ততক্ষণে হুঁকোটা রেখে নলটা তুলে দিয়েছে ইকরাম আলীর হাতে। ইকরাম আলী আবার তুলে ধরলেন তার অতিথিদের দিকে।

কিন্তু অতিথিগণ গ্রাম্য সাধারণ ব্যক্তি নন। তাঁরা হুঁকো সেবন করতে সম্মত নন। তাঁরা নিজ নিজ পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে সিগারেট ধরালেন।

গোপন আলোচনা চললো।

কাগজে লিখা হলো দলিল বা বন্ড জাতীয় কিছু।

তারপর ওরা বিদায় গ্রহণ করলো।

মালেক মিয়া কিন্তু ওদের কথাবার্তা সব শুনে নিলো। সে বুঝতে পারলো, দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য রিলিফ এসেছিলো মূল্যবান কোনো সামগ্রি সেই রিলিফ বস্তু শহরের কালোবাজারী দলের কাছে হস্তান্তর করা হলো। আজকের কথাবার্তা বা লেখালেখি তারই চুক্তিপত্র।

মালেক মিয়ার ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো, তবু নিজকে সংযত করে রাখলো সে সুযোগের প্রতীক্ষায়। রিলিফের মাল এসেছে গ্রামের জনগণ টেরও পেলো না। তৃতীয় রাতে সমস্ত গ্রাম যখন নিশুতির কোলে ঢলে

পড়লো তখন আবার ট্রাক এলো ট্রাক বোঝাই হলো। রাতের অন্ধকারে মাল সহ ট্রাক উধাও হলো, জানলো না কেউ।

পরদিন।

মালেক মিয়া কাজ শেষ করে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় শোনা গেলো অন্তঃপুর থেকে ইকরাম গৃহিনীর ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর—হাবলুর জ্বর হয়েছে, ওর শরীরে তেল মালিশ করে দেবে যাও। আজ আর ঘাটে পানি আনতে যেতে হবে না, পানি আনবে মালেক মিয়া।

মালেক মিয়া কান পেতে রইলো, হয়তো গোলাপীর কণ্ঠ শোনার প্রতীক্ষায়, কিন্তু কোনো সাড়া এলো না অপর পক্ষের।

পুনরায় সেই ঝাঁঝালো কণ্ঠ—তবু কলসী কাঁখে নিচ্ছো? যাও তেলের বাটিতে তেল নিয়ে হাবলুর ঘরে যাও, বাছার আমার শরীরে নাকি বড় ব্যথা হয়েছে।

এবার গোলাপীর কণ্ঠস্বর—আমি পারবো না।

সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠলেন ইকরাম গৃহিনী—কি বললে, পারবে না? স্বামীর শরীরে তেল মালিশ করে দেবে তাই পারবে না? স্বামীর সেবা মেয়েদের ধর্ম, এটা মেয়ে হয়ে তুমি বুঝোনা? যাও, যাও বলছি........

না, আমি পারবো না।

তবে আজ তোমার খাওয়া বন্ধ, দেখি কি খাও—আর কে তোমাকে খেতে দেয়।

এরপর আর কোনো কথা শোনা গেলো না। মালেক মিয়া কাজে বেরিয়ে গেলো, ফিরে এলো সন্ধ্যার পূর্বে।

হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে বসলো। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা এলিয়ে দিলো বিছানায়। ছোট্ট চাকর ছেলেটা এসে ভাতের থালা আর তরকারির বাটি রেখে গেলো।

মালেক মিয়া একটা লঘু পদশব্দ শোনার প্রতীক্ষায় আছে কিন্তু কই, ছেলেটা ভাত-তরকারি রেখে যাবার পর কেউ তো এলো না। রোজ

গোলাপী আসে আঁচলের তলায় ভাত তরকারি নিয়ে। গরম ভাত-তরকারি রেখে বাসিগুলো নিয়ে যায়। আজ আসছে না ব্যাপার কি?

মালেক মিয়া উঠে এলো ভাতের থালার পাশে। ভাতে হাত দিতেই হাতখানা তার বসে গেলো ভাতের মধ্যে। পচা গলে যাওয়া ভাত। তরকারিটা নাকে ধরতেই বুঝতে পারলো টক হয়ে কেমন যেন আম্‌লা গন্ধ বের হচ্ছে বাটি থেকে। মালেক মিয়া রেখে দিলো ভাত-তরকারি, তারপর গেলাস থেকে পানি গুলো ঢক্‌ঢক্‌ করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।

কেরোসিনের কুপিটা তখন দপ দপ করে জ্বলছে।

সমস্ত কক্ষটা নীরব।

দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই সে কক্ষে। ছোট মেটে ঘর, তার একটিমাত্র জানালা। সেই কক্ষে শুধুমাত্র শোয় মালেক মিয়া। এ কক্ষে বড় একটা কেউ আসে না।

মালেক মিয়া তাই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে।

রাতে ঘুমাবার পূর্ব মুহূর্তে মালেক মিয়া তার মুখ থেকে খুলে ফেলে দাঁড়ি-গোঁফ। ছোট্ট পুঁটলি থেকে আয়না আর সেভ্‌ করার সরঞ্জাম বের করে নিয়ে পরিস্কারভাবে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলে। তারপর ঘুমায়।

অবশ্য ভোর হবার পূর্বে দরজা বন্ধ অবস্থায় দাড়ি-গোঁফ পরে নেয় নিখুঁতভাবে। মালেক মিয়ার পুঁটলির মধ্যেই আছে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

মালেক মিয়া ঘুমাবার পূর্বে দরজা বন্ধ করে ঘুমাতো। আজও ঘুমাবার পূর্বে যেমনি সে উঠতে যাবে, এমন সময় গোলাপী এসে দাঁড়ালো।

বললো মালেক—কে, গোলাপী?

হ্যাঁ।

মালেক দেখলো তার আঁচলের নিচে আজ ভাতের থালা বা তরকারির বাটি নেই। কুপির আলোতে মুখখানা বড় শুকনো লাগছে। বড় ম্লান, বড় বিষণ্ন ওর মুখখানা।

মালেক মিয়া শুয়ে ছিলো উঠে বসলো, বললো সে—গোলাপী, কি হয়েছে তোমার?

মালেক মিয়ার কথায় গোলাপীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, কোনো জবাব সে দিলো না।

মালেক মিয়া বললো—জানি, সব আমি শুনেছি।

গোলাপী চোখ দুটো তুলে ধরলো মালেক মিয়ার মুখে, ঠোঁট একটু নড়ে উঠলো, হয়তো বা কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু বলতে পারলো না।

মালেক মিয়ার মনটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো। কুপির আলোটা যেন ওর মুখখানাকে আরও করুণ করে তুলেছে, বললো—জানি আজ সারাদিন তোমাকে ওরা খেতে দেয়নি...

তুমি......তুমি কেমন করে জানলে ওরা আমাকে আজ খেতে দেয় নি?

জানি! গোলাপী, তোমার যে কি ব্যথা, কি যন্ত্রণা আমি বুঝতে পেরেছি। গোলাপী, তোমার দাদুকে তুমি খুব ভালবাসতে না?

হাঁ, দাদু আমাকে খুব ভালবাসতো তাই......

তাই তুমিও তাকে খুব ভালবাসতে?

হাঁ।

কিন্তু তোমার দাদু তোমাকে যদি ভালই বাসতেন তাহলে তোমার সুন্দর ফুলের মত জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করে দিতেন না, তোমাকে এভাবে তিনি হত্যা করতেন না। গোলাপী, তোমার দাদু...তোমার দাদু তোমাকে হত্যা করেছেন। একটু থেমে বলে মালেক মিয়া—হাবলুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমাকে গলা টিপে হত্যা করে গেছেন তোমার দাদু......

মালেক ভাই!

হাঁ, আমি জানি হাবলুর সঙ্গে বিয়ে হলেও তুমি হাবলুকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারোনি।

মালেক ভাই, তুমি কি করে জানলে আমার মনের কথা? কে বললো তোমাকে এ সব?

কেউ আমাকে বলেনি, তোমার মুখ দেখলেই আমি সব বুঝতে পারি।

মালেক ভাই, তোমাকে দেখলে সত্যি মনে হয় তুমি যেন আমার কত আপনজন। আমাকে তুমি ভালবাসো, স্নেহ করো......মালেক ভাই, রোজ তোমাকে রাতে পচা ভাত আর বাসি তরকারি খেতে দেয়। আমি জানি তুমি ওসব খেতে পারবে না, তাই রোজ আমার খাবার তোমাকে এনে দেই...

বলো কি গোলাপী!

আজ আমাকে ওরা খেতে দেয়নি—দিনেও না রাতেও দেয়নি, তাই তোমাকে আজ উপবাস থাকতে হলো......চাপা কান্নায় কণ্ঠ ধরে আসে গোলাপীর।

মালেক মিয়ার দু চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ে, সে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। রোজ তাহলে গোলাপী নিজে না খেয়ে তাকে খাওয়াতো, রোজ উপবাসে থাকতো সে, বললো মালেক মিয়া—তুমি না খেয়ে প্রতিদিন আমাকে তোমার ভাতগুলো দিয়ে যেতে আর তুমি উপবাসে থাকতে, তাই না?

আমি সব খেতে পারি মালেক ভাই। তোমার এখান থেকে যে ভাত আমি নিয়ে যেতাম ঐ ভাত আমি পেট পুরে খেতাম।

তুমি ঐ পচা ভাত খেতে?

আমরা মেয়েমানুষ, সব সহ্য করতে পারি।

যেমন মুখ বুঁজে সহ্য করছো তোমার পিশাচ শ্বশুর-শাশুড়ির নিষ্ঠুর নির্মম হৃদয়হীন আচরণ?

মালেক ভাই, তুমি কত সুন্দর করে কথা বলতে পারো। এমন কথা তুমি কোথায় শিখেছো মালেক ভাই?

গোলাপী, তোমার মন সুন্দর তাই তুমি আমার কথাগুলোকে সুন্দর বলছো। একটা কথা মনে রেখো, তোমার দাদু নিজকে ঋণমুক্ত করবার জন্য তোমাকে এক বদ্ধ পাগলের হাতে সঁপে দিয়ে গেলেও তিনি আসলে ঋণমুক্ত হতে পারেননি বরং তাঁর আত্মার দারুণ অশান্তি ভোগ করছে। বানরের গলায় মুক্তার মালার মতই হয়েছে তোমার অবস্থা।

গোলাপীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা অশ্রু। মালেক মিয়া বললো—হাবলুর বুঝি অসুখ হয়েছে?

হাঁ, সারাদিন বাড়ির পিছনে পচা পুকুরে মাছ ধরেছিলো।

গরু-মহিষের মতই ওর স্বভাব, কাজেই জ্বর হয়েছে।

হাঁ, জ্বর হয়েছে। আমাকে বলে ওর সেবাযত্ন করতে। আমি প্রাণ গেলেও পারবো না, পারবো না ওর সেবাযত্ন করতে......কথাটা এক নিঃশ্বাসে বলে গোলাপী, তারপর একটু থেমে বললো আবার—মালেক ভাই, আমার আপনজন বলতে কেউ নেই। যদি কেউ থাকতো আমি পালিয়ে যেতাম; এই দোযখে আমি থাকতাম না।

নীরবে শুনে যায় মালেক মিয়া।

গোলাপী বলে—মালেক ভাই, তোমার যদি কোনো বাড়ি থাকতো আমি চলে যেতাম তোমাদের ওখানে। তুমি সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে, আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকতাম ভাতের থালা আগলে নিয়ে। তবু আমি শান্তি পেতাম মালেক ভাই।

মালেক মিয়ার ইচ্ছা হলো কিছু সান্তনা বাক্য শোনায় কিন্তু পারলো না সে কোনো কথা বলতে, কে যেন তার কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছে।

গোলাপীর ব্যথা তাকে ব্যথিত করে কিন্তু ঐ মুহূর্তে কোনো পথ নেই তাকে এ দুর্বিষহ অবস্থা থেকে উদ্ধার করার। বলে মালেক মিয়া—যাও, এবার ঘরে যাও।

গোলাপী কোনো কথা উচ্চারণ না করে নীরবে মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেলো।

মালেক মিয়া নিস্তব্ধ প্রাণহীন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো দরজার পাশে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে গেলো গোলাপী। সমস্ত দিনটা ওর উপবাসে কেটেছে, এবার কাটবে সমস্ত রাতটা। বেচারী তরুণী গোলাপী—কিই বা এখন ওর বয়স হয়েছে, তার উপরে চলেছে কি নির্মম আচরণ!

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ, তারপর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। পুঁটলি খুলে বের করলো তার জমকালো দস্যুড্রেস। দাঁড়ি-গোফ খুলে রেখে পরে নিলো তার পোশাক। মাথার পাগড়ির আঁচলে ঢেকে

ফেললো মুখের নিচের অংশ। বেরিয়ে এলো দরজা খুলে ঘরের বাইরে দস্যু বনহুর।

সমস্ত গ্রামখানা তখন নিস্তব্ধ। গ্রামের ঘরে ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে সবাই। গোয়ালে গরুগুলো এখন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে না, কাঁধের উপর মাথাটা কাৎ করে শুয়ে আছে চোখ দুটো মুঁদে। মাঝে মাঝে অবশ্য লেজ নেড়ে মশা তাড়াচ্ছিলো। গোয়ালে ধুঁয়ো দিয়েছে গেরস্থ, যাতে মশার উপদ্রব কিছু হ্রাস পায়। এখন অবশ্য আগুন নিভে ছাই হয়ে গেছে, সামান্য একটু ধুঁয়ো ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে।

গোয়ালের পাশে একটি নেংটি কুকুর জড়সড় হয়ে আছে। কখনও বা একটু আওয়াজ পেলেই ঘেউ ঘেউ করে উঠছে কিন্তু জায়গাটা ছেড়ে নড়ছে না, যদি তার শরীরের গরমে উষ্ণ জায়গাটা আবার ঠান্ডা হয়ে যায়। অবশ্য ঠান্ডার দিন নয় যদিও, তবু নেংটি কুকুরটা নিজের জায়গায় হয়তো নড়চড় করতে চায় না।

অন্ধকারে বনহুর এগিয়ে গেলো অন্তঃপুরের দিকে।

তার বুটের শব্দে নেংটি কুকুরের সজাগ কান খাড়া হয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা তুলে আওয়াজ করলো ঘেউ ঘেউ ঘেউ......কিন্তু জায়গা ত্যাগ করলো না সে।

ততক্ষণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে বনহুর।

ও ঘর থেকে ভেসে এলো হাবলুর গোঙানির শব্দ, জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছে হাবলু। শোনা গেলো মায়ের কণ্ঠ—কি হলো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? ঠিকমত বাতাস করো, নইলে কালকেও তোমার ভাত বন্ধ মনে রেখো.........

বেড়ার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বনহুর। ভিতরে নজর পড়তেই দেখতে পেলো হাবলু বিছানায় শুয়ে আছে একটা গরিলারাজের মত। নেড়ে মাথাটার কাছে পাখা হাতে বসে আছে গোলাপী। গোলাপীর একখানা হাত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। কয়েকগাছা লাল চুড়িতে হাতখানাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিলো। লণ্ঠনের আলোতে আরও দেখা গেলো তালপাখা নিয়ে স্বামীর

মাথায় বাতাস করছে গোলাপী। মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পাখাটা থেমে যাচ্ছিলো, তখনই খেঁকিয়ে উঠছিলেন ইকরাম গৃহিনী। তিনি পুত্রের পাশেই অপর এক বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিলেন।

পাখার শব্দ থেমে গেলেই হাবলুর জননীর নিদ্রাঘোর ছুটে যাচ্ছিলো, তিনি খেঁকিয়ে উঠে সাবধান করে দিচ্ছিলেন, যাতে বাতাস করা বন্ধ না নয়।

বেচারী গোলাপী বাতাস করছিলো আর ঝিমুচ্ছিলো। লণ্ঠনটা মেঝের একপাশে জ্বলছে, তারই আলোতে পাখাটার ছায়া দেয়ালে দুলছিলো। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিলো কক্ষটার মধ্যে।

বনহুর সরে গেলো সেখান থেকে, প্রবেশ করলো বৈঠকখানা কক্ষে। এ কক্ষে শুধুমাত্র কয়েকটা চেয়ার, একটা টেবিল ছাড়া যদিও কিছু ছিলো না তবুও বনহুর এ কক্ষে এলো কেন? ছোট্ট টর্চলাইটের আলো ফেললো, দেখতে লাগলো সে দেয়ালের চারপাশে। ছোট্ট একটা দরজার গায়ে বিরাট একটি তালা ঝুলছে।

বনহুরের মুখে ফুটে উঠলো একটা মৃদু হাসির রেখা। আলগোছে তালাটা সে খুলে ফেললো, তারপর চাবির গোছা রেখে দিলো পকেটে। তালা খুলে প্রবেশ করলো চোরা কুঠরির মধ্যে। টর্চের আলো ফেলে সে দেখতে লাগলো, চোরা কুঠরির মেঝে থেকে ছাদ অবধি স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে বস্তা বোঝাই কোনো সামগ্রি। বনহুরের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো, সে বস্তায় হাত রেখেই বুঝতে পারলো চাল ছাড়া সেগুলো কিছু নয়।

এত চাল জমা করে রেখে দিয়েছে ইকরাম আলী। সব যে তার জমির ধানের চাল তা নয়, প্রতি হাটবার বিশ মণ করে চাল কিনে রাখেন সে। এই মজুত চাল কি করবে সেই জানে। বাড়ির কোনো লোক এই চোরা কুঠরির মধ্যে প্রবেশে সক্ষম নয়।

বনহুর চোরা কুঠরি থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে।

ইকরাম আলীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো সে অতি সন্তর্পণে। শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পিস্তলের আগা দিয়ে ইকরাম আলীর গায়ের চাদর

সরিয়ে দিতেই সুখনিদ্রা ছুটে গেলো তার। চোখ মেলতেই আঁতকে উঠে বললো—কে? এ্যাঁ এ্যাঁ কে তুমি?

বনহুর চাপাকণ্ঠে বললো—তোমার বন্ধু।

বন্ধু!

হ্যাঁ, বলো তোমার চোরা কুঠরিতে কত মণ চাল মজুত আছে?

কেন......কেন তুমি এ কথা জানতে চাইছো?

জানতে চাইছি কাল তোমার দরজায় এসেছিলো যারা তারা কারা?

তারা......তারা গ্রামের গরিব মানুষ, চাল কিনবে বলে এসেছিলো......

কেন তাদের কাছে চাল নেই বলেছিলে, কেন তুমি অস্বীকার করেছিলে তোমার চোরা কুঠরির মজুত চালের কথা?

ওরা কি আমার চালের মূল্য দিতে পারবে? এখন যে চালের অনেক দাম।

তুমি কত মূল্যে কিনে মজুত করেছো?

কোনো জবাব দেয় না ইকরাম আলী মিয়া। বনহুর পিস্তল চেপে ধরে—জবাব দাও?

ইকরাম আলী সহজে ভয় পাবার লোক নয়, সে ঝানু মজুতদার, বললো—তুমি জবাব দাও কোন্ অধিকারে আমার বাড়িতে প্রবেশ করেছো?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর, পিস্তল তখনও ইকরাম আলীর বুকে ঠেকে আছে।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে দরজায় এসে দাঁড়ায় গোলাপী। শ্বশুরের বুকে পিস্তল চেপে ধরে একটি জমকালো মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে উঠলো গোলাপী—উঃ মা গো......টলে পড়ে যাচ্ছিলো সে।

এ মুহূর্তে বনহুর স্থির থাকতে পারলো না, তাড়াতাড়ি গোলাপীর সংজ্ঞাহীন দেহটা ধরে ফেলে এবং দ্রুত তাকে শুইয়ে দেয় ইকরামের বিছানায়, তারপর ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে যায় কক্ষের বাইরে।

ইকরাম আলী ততক্ষণে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে—ডাকাত......ডাকাত......ডাকাত পড়েছে......কে কোথায় আছো বাঁচাও.......বাঁচাও......

ইকরাম আলীর চিৎকার শুনে চারদিক থেকে ছুটে আসে সবাই। ইকরাম গৃহিনী, চাকর-বাকর, আত্মীয়স্বজন সবাই, এমন কি মালেক মিয়াও ছুটে আসে তার ঘর থেকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে।

সবাই বলে—ব্যাপার কি, ব্যাপার কি?

ইকরাম আলীর পাশের বাড়ি থেকে ছুটে এসেছেন পরমানিক মিয়া। বুড়ো মানুষ চোখে ভাল দেখেন না, তিনিও উদগ্রীবভাবে প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে?

ইকরাম আলী শুধু বলে চলেছে—ডাকাত এসেছিলো...আমার বাড়িতে ডাকাত এসেছিলো...... সর্বনাশ, আর একটু হলে আমাকে খুন করে করে বৌমাকে ধরে নিয়ে যেতো সে...বৌকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছিলো.........

কেউ কেউ গোলাপীর মাথায় পানি ঢালতে শুরু করে দিয়েছে। এক সময় জ্ঞান ফিরে এলো গোলাপীর! সে কোনোদিন চোর-ডাকাত বা এ ধরনের লোক দেখেনি। হঠাৎ সে শ্বশুরের ঘরে অদ্ভুত শব্দ শুনে দ্রুত গিয়ে হাজির হয়েছিলো এবং দেখতে পেয়েছিলো জমকালো একটি মূর্তি। দেখেই সে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো।

বাড়িতে মানুষ ভরে গেছে, সবার মুখেই আতঙ্কের ছায়া।

সবাই ব্যস্তভাবে ইকরাম আলীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে।

মালেক মিয়া এসে দাঁড়াতেই বললেন ইকরাম আলী— নাকে তেল দিয়ে খুব ঘুমিয়েছিলে বুঝি? এদিকে বাড়িতে ডাকাত পড়েছিলো জানিস্ না তুই?

মালেক মিয়া ভীতকণ্ঠে ঢোক গিলে বললো—ডাকাত! বলেন কি মালিক?

হাঁ, ডাকাত এসেছিলো, আমার টাকা-পয়সা সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বৌমাকেও নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছিলো কিন্তু বৌমা অজ্ঞান হয়ে পড়ায় তাকে ছেড়েই পালিয়ে গেছে...

মালেক মিয়া দু'চোখ কপালে তুলে বলে উঠে—বলেন কি মালিক, সব টাকা-পয়সা ডাকাত ছিনিয়ে নিয়ে গেছে! সর্বনাশ, বৌমাকেও ডাকাত নিয়ে যাবার জন্য......

হাঁ, দেখছো না তাই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। যাও, ওর মাথায় পানি ঢালো গে। ইকরাম আলী কথাগুলো বলে গোলাপীকে দেখিয়ে দিলো।

ততক্ষণে কতকগুলো গ্রাম্য মহিলা গোলাপীকে ঘিরে ধরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে নানা রকম উক্তি উচ্চারণ করতে শুরু করে দিয়েছিলো। কেউ বলছে, গোলাপীর রূপ দেখেই ডাকাত এসেছিলো তাকে নিয়ে যাবার জন্য। কেউ বলছে, এত রূপ ভাল নয়। কেউ বলছে, গোলাপী বৌ বড় কুলক্ষুণে, নাহলে এমন তাজা ছেলের অমন অসুখ হবে কেন? কেউ বলছে, ওর নিঃশ্বাস ভাল নয়......এমনি নানা জনের নানা কথা।

গোলাপীর মাথায় ছোট্ট চাকর ছেলেটা পানি ঢালছিলো, মালেক মিয়া তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলো।

চোখ মেলে তাকাচ্ছে গোলাপী।

মালেক মিয়া বললো—ভয় নেই গোলাপী—ডাকাত চলে গেছে।

গোলাপীর চোখেমুখে তখনও উৎকুণ্ঠার ছাপ ফুটে আছে। সমস্ত রাতটা নানা রকম হই হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে কেটে যায়।

পরদিন হাবলুর অসুখ অনেক কমে গেছে।

ইকরাম গৃহিণী ছেলেকে নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠেছেন। তাকে পথ্যাপথ্য দিতে হবে। গোলাপী ঘাটে পানি আনতে যায়নি বলে তাকে গালমন্দ করছেন তিনি খুব করে।

গোলাপী নীরবে পানি আনতে চলে গেলো। যদিও তার মনে এখনও রাতের সেই জমকালো মূর্তির ভয় দাগ কেটে বসে আছে, তবু তাকে যেতে হলো নদীর ঘাটে।

মালেক মিয়ার সাহায্য আজ সে নিলো না।

মালেক মিয়া অবশ্য ঘাটে না গেলেও যাবার সময় কলসী চেয়েছিলো—গোলাপী বৌ, আমাকে কলসী দাও, আমি পানি এনে দেই।

গোলাপী বলেছিলো—তা হয় না, মালেক ভাই, রোজ তুমি আমার জন্য কষ্ট করবে? আমি নিজেই যাবো ঘাটে পানি আনতে।

মালেক মিয়া চলে গেলো অন্য কাজে। যখন সে ফিরে এলো তখন দেখলো কতকগুলো কঙ্কালসার অর্ধ উলঙ্গ লোক বৈঠকখানার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

মালেক মিয়া নিকটে পৌছে বুঝতে পারলো তারা চাল কিনতে এসেছে, সবার হাতে ছেড়া থলে, কারও বা হাতে গামছা রয়েছে।

বারান্দায় জলচৌকির উপর বসে হুঁকো টানছেন ইকরাম আলী মিয়া। তার পাশে বসে আছে গ্রামের আরও দু'জন মাতব্বর গোছের লোক।

মালেক মিয়া নিকটে আসতেই শুনতে পেলো বলছে ইকরাম আলী—পাঁচ টাকার কম এক সের চাল বিক্রি করবো না, যদি নিতে চাও নেবে না হয় বিদায় হয়ে যাও।

ইকরাম আলীর পাশে যিনি ছিলেন তিনি পান চিবুতে চিবুতে বললেন—ইকরাম, আমার কথা শোনো, আর কয়েকটা দিন যদি রাখতে পারো চালের দাম দশ টাকা সের না হয়ে যাবে না।

কিন্তু আজ রাতে ডাকাত এসেছিলো, হাতে তার পিস্তল...

রেখে দাও তোমার ডাকাত। গ্রামের চৌকিদারকে বলে রেখো সে যেন রোজ তোমার বাড়িতে মোতায়েন থেকে পাহারা দেয়।

ইকরাম আলী বললো—চৌকিদার ছাড়াও মালেক মিয়া আছে। বুড়ো হলেও সে জোয়ান মানুষের মত শক্তি রাখে। তাকেও একগাছা মোটা লাঠি নিয়ে পাহারায় রাখবো। বাস্ তা হলেই ডাকাত তো দূরের কাথা, ডাকাতের বাবা আসতে পারবে না।

হাঁ তাই করো। ডাকাতের ভয়ে যদি এখনই সব চাল বিক্রি করে দাও তাহলে মস্ত লোকসান হবে, কাজেই এসব লোককে ভাগিয়ে দাও এখান থেকে......

ইকরাম আলী হুকো রেখে উঠে দাঁড়ালো, তাঁরপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সবাইকে বললেন—যাও তোমরা, আমি চাল বিক্রি করবো না।

সবার মধ্য থেকে এক বৃদ্ধ বলে উঠলো—তাহলে আমরা কি মরে যাবো?

মরো! তোমাদের মত মানুষ মরে যাওয়াই ভাল। যাও, চাল বিক্রি করবো না। ইকরাম আলী সবাইকে তাড়িয়ে দেয়।

গ্রামের দুঃস্থ জনগণ চোখ মুছতে মুছতে ফিরে যায় যে যার ঘরের দিকে।

মালেক মিয়া তখন দাঁড়িয়ে ছিলো একপাশে, সব সে লক্ষ্য করছিলো। ইকরাম আলী মালেক মিয়াকে বললো—যাও, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো, কামলারা জমি থেকে ধান কেটে আনছে, তাদের সব দেখিয়ে দাও কোথায় ওরা ধান রাখবে। আর শোনো যে ধান উঠানে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে, ঐ ধান রোদে মেলে দাও। শুকিয়ে গেলে গোলায় তুলে রাখবে।

আচ্ছা মলিক।

চলে যায় মালেক মিয়া।

ইকরাম আলী তার সঙ্গী সহ গোপন আলোচনায় বসে।

মালেক মিয়া উঠানে ধান বিছিয়ে দিতে দিতে ভাবে এত ধান দেশে তবু এত অভাব কেন শুধু ইকরাম আলীর ঘরে নয়, গ্রামে অনেকের ঘরেই প্রচুর ধান এসেছে। জমি ভরা ধান। তবু ধান চালের এত মূল্য কেন বৃদ্ধি হলো? মন তার জবাব দিলো, ইকরাম আলীর মত মানুষদের জন্যই দেশে এত ফসল ফলেও ফসলের মূল্য এত বেশি। যতদিন এইসব মুনাফাকারী দলকে শায়েস্তা করা না হবে, ততদিন দেশের মহাসঙ্কট কাটবে না। এরা অর্থলোভী শ্বাপদের দল, নরপশুর দল, দেশের এই মহা বিপর্যয়ের জন্য দায়ী এইসব জানোয়ার.......দাঁতে দাঁত পিষে মালেক মিয়া।

কাজ শেষ করে সোজা সে চলে যায় নদীর ধারে যেখানে নির্জন জায়গা সেখানে সে একটি গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ায়।

আশেপাশে কোনো লোক নেই, খুলে ফেলে সে তার ছদ্মবেশী দাড়ি গোঁফ। নদী থেকে পরিস্কার করে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসে সে গাছের তলায়। স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে তার সমস্ত শরীর শান্ত হয়ে আসে।

গাছে হেলান দিয়ে ভাবছিলো দেশের এই চরম অবস্থার কথা। গ্রামে এমন অনেক লোক আছে যারা তিন সন্ধ্যাই না খেয়ে আছে। হয়তো একমুঠো চাল কোনো রকমে জোগাড় করে একগাদা কচুপাতার সঙ্গে মিশিয়ে সেদ্ধ করে কোনো রকমে উদর পূর্ণ করছে। কত জনের ভাগ্যে এক মুঠো চালও জুটছে না, শুধু কচুপাতা সেদ্ধ আর কলাগাছ সেদ্ধ খেয়ে জীবন রক্ষা করছে। এদের অবস্থা সে নিজের চোখে দেখেছে। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সেদিন এক চাষী তার বাড়ির উঠানে গভীর কুয়ার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো। তার লাশ যখন কুয়া থেকে উঠানো হলো তখন ভিড় করেছিলো সেখানে অনেক ছেলে, পুরুষ এবং মহিলা। সবাই নির্বাক চোখে দেখছিলো। কেউ কেউ বলেছিলো মরে কলিম শেখ বেঁচেছে, আজ সাতদিন তার ঘরে কোনো খাবার ছিলো না। ছেলে মেয়েরা না খেয়ে সারাদিন কাঁদলেও সে আর দেখতে আসবে না। বেচারী কলিম শেখের অবস্থা আজ সবার ঘরে ঘরে......কিন্তু কেন কেন আজ দেশের এই চরম অবস্থা.........

হঠাৎ চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বনহুরের, পিছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ফেরাতই চমকে উঠলো, গোলাপী দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি গোলাপী চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

বনহুর বুঝতে পারলো গোলাপী তাকে এই পথে আসতে দেখেছিলো, তাই হয়তো সে এসেছে তার মালেক ভাইয়ের সন্ধানে। বললো বনহুর—শোনো!

থামলো গোলাপী, চোখেমুখে তার একরাশ লজ্জার দ্বিধা।

বনহুর বললো—কাউকে খুঁজছো বুঝি?

বললো গোলাপী,—হাঁ! আপনি কে? আপনাকে তো কোনোদিন এ গ্রামে দেখিনি?

বনহুর বললো—আমি পথিক, এই পথে যাচ্ছিলাম, বড় রৌদ্র, তাই এই গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছি। কই, আমি যা জিজ্ঞাসা করলাম তার কোনো উত্তর দিলে না তো—কাউকে খুঁজছো তুমি, না?

হাঁ, আপনি কি করে জানলেন আমি কাউকে খুঁজছি?

তোমার চোখমুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে তুমি কারও সন্ধান করছো।

হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। জানি না আপনি কতক্ষণ হলো এখানে এসেছেন। এইদিকে আমার মালেক ভাই এসেছিলো একটু আগে, তাই......

কেমন চেহারা তার?

বুড়ো মানুষ, কিন্তু বড় সুন্দর তার ব্যবহার......

হাঁ, একটু পূর্বে এক বৃদ্ধ এখানে বসেছিলো, আমি আসার পর সে চলে গেলো। সেই বৃদ্ধ তোমার আত্মীয় হয় বুঝি?

আত্মীয় ঠিক নয়, কিন্তু আমার দাদুর মত, তাই আমি তাকে দাদু বলে ডাকি, তবে সবার সামনে মালেক ভাই বলি। লজ্জাজড়িতভাবে কথাগুলো বলে চলে যাচ্ছিলো গোলাপী।

বনহুর বললো—শুনে যাও, সে যদি আসে তাকে কি বলবো?

আমার মালেক ভাই কিছু খায়নি কিনা, আমি তার ঘরে খাবার রেখে খুঁজতে এসেছিলাম।

তুমি বুঝি তাকে ভালবাসো?

হাঁ, আমি তাকে খুব ভালবাসি, আমাকেও সে অনেক ভালবাসে, স্নেহ করে। এই হাজরা গ্রামে তার কেউ নেই আমি ছাড়া......

আচ্ছা এলে বলবো।

আপনি এক্ষুণি চলে যাবেন বুঝি?

হাঁ।

আপনি আর আসবেন না হাজরা গ্রামে?

এখানে আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই তাই কার কাছে আসবো।

আপনার বাড়ি কোথায়?

আমি বিদেশী। যখন যেখানে যাই সেখানেই আমার দেশ। যখন যে গ্রামে বাস করি সেই গ্রামের মানুষ আমার আপন জন......

এসব আপনি কি বলছেন?

হাঁ, যা সত্য তাই বলছি।

সত্যি আমার কোনো উপায় নেই, নাহলে আপনাকে আমি নিয়ে যেতাম আমাদের বাড়িতে, কিন্তু......

কেন, কি অসুবিধা তোমার?

সে অনেক কথা, আপনি বুঝবেন না। যদি আমার দাদুর সঙ্গে আপনার দেখা হয় তার কাছেই আপনি জিজ্ঞাসা করে নেবেন, গোলাপী কে এবং তার বাড়ি আছে কিনা? আচ্ছা চলি?

বনহুর বললো—তোমার দাদু এলেই পাঠিয়ে দেবো।

গোলাপী চলে গেলো।

বনহুর দ্রুতহস্তে পরে নিলো তার দাড়ি-গোঁফ। দাড়ি-গোঁফ ভাগ্যিস সে গামছার নিচে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলো, নাহলে গোলাপী ঠিকই দেখে ফেলতো বনহুর মালেক মিয়ায় পরিণত হলো।

ঘরে ফিরে দেখলো খাবার থালা ঢাকা দেওয়া রয়েছে। গরম ভাত আর কিছু তরকারি। পেট পুরে খেলো মালেক মিয়া।

এমন সময় এলো গোলাপী, দাদু তুমি এসেছো?

হাঁ এলাম।

খেয়েছো?

খেয়েছি! সত্যি তুমি আমার জন্য কত করো। বসো গোলাপী, একটু বসো না।

বসছি কিন্তু হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে?

এই বুড়ো মালেকের কাছে বসলে কেউ কিছু বলবে না, তুমি বসো!

গোলাপী বসে পড়লো।

মালেক মিয়া বললো—কাউকে তুমি আমার কথা বলেছিলে?

হাঁ, ঐ বটতলায় একটা লোক বসেছিলো, তোমাকে খুঁজতে গিয়ে তাকে সেখানে দেখে বলেছিলাম, আমার দাদু এলে তাকে পাঠিয়ে দিবেন। জানো দাদু লোকটা ভারী সুন্দর।

ভারী সুন্দর।

হাঁ তুমি নিজেও তো দেখেছো তাকে?

দেখেছি কিন্তু কই তেমন সুন্দর বলে তো মনে হলো না।

তুমি বুড়ো মানুষ, তাই চোখে কম দেখো। এমন সুন্দর পুরুষ আমি কোনোদিন দেখিনি দাদু। আমার বড় লজ্জা করছিলো, নাহলে আমি প্রাণভরে ওকে দেখতাম, বড় ভাল লাগছিলো......

সত্যি বলছো?

হাঁ দাদু। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে ত্যাগ করে বলে গোলাপী—ও বলেছিলো হাজরা গ্রামে ওর কেউ নেই তাই নদীধারে বটতলায় বসে বিশ্রাম করছিলো। যদি আমার এ বাড়িতে অধিকার থাকতো তাহলে ওকে আমি আমার বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ করতাম।

গোলাপী, তোমার হৃদয় অতি মহৎ, তাই তুমি এমন কথা ভাবো। আমাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য তোমাকে কত তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে......

তবু আমার মনে শান্তি পেয়েছি দাদু। একজন নিরাশ্রয়কে ঠিক আশ্রয় দিতে না পারলেও একটু থাকার মত জায়গার সংস্থান করে দিতে পেরেছি। তোমার খুব কষ্ট হয় দাদু তবু এতটুকু স্বস্তি পাই এই হাজরা গ্রামে আমি যেমন অসহায়, তেমনি তুমিও। আমরা দু'জনই অসহায়, তাই......

মালেক মিয়া গামছায় হাওয়া খেতে খেতে বলে—সেদিন যদি তুমি আমাকে না নিয়ে আসতে তাহলে হয়তো এই হাজরা গ্রামে একটি দিনও আমার থাকা সম্ভব হতো না গোলাপী তাই আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে।

এমন সময় শোনা গেলো হাবলু কণ্ঠের অদ্ভুত শব্দ, হঠাৎ সে তার জননী সহ উপস্থিত হলো সেখানে। হাবলু কখন চুপি চুপ দেখে গিয়েছিলো

মালেকের ঘরে গোলাপীকে। সে তার জননীকে ডেকে এনেছিলো। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে হাবলু অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করলো।

দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠলেন ইকরাম গৃহিনী—হতভাগী মেয়ে, তুমি এখানে এসে বুড়োর কাছে বসে আছো, ওদিকে কত কাজ পড়ে আছে। বসে বসে ভাত গেলো আর কাজের বেলায় সব ফাঁকি। বুড়োলোকটা এনে বাড়িতে ঢুকিয়েছো, তাকে যে গাদা গাদা খেতে দিতে হয় এ সব আসে কোথা থেকে? হাবলু ওর চুল ধরে টেনে নিয়ে চল্—আজ সব তোর বাপকে বলবো......

হাবলু জননীর কথা হয়তো বুঝতে পারলো, সে লাফ মেরে গিয়ে দু'হাতে গোলাপীর চুল টেনে ধরলো, তারপর হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললো।

অসহায় গোলাপী মুখে কোনোরকম শব্দ করলো না, নীরবে সে বেরিয়ে গেলো। গুণধর স্বামীর হাতের মুঠায় তার চুলের গোছা।

মালেক মিয়া অতি কষ্টে নিজকে সংযত করে রাখলো। হাবলু জননী তখন ভীষণভাবে গালমন্দ শুরু করে দিয়েছেন।

সমস্ত দিন আর গোলাপীর সাক্ষাৎ মিললো না। রাতেও মালেক মিয়ার পঁচা ভাতের পরিবর্তে টাটকা ভাত এলো না। মালেক মিয়া বুঝতে পারলো হাবলু ও তার জননী বেচারী গোলাপীর উপর নানা রকম উৎপীড়ন চালিয়ে চলেছে।

রাতে শুয়ে ভাবছে গোলাপীর কথা। ইকরাম আলীকে শায়েস্তা করতে তার বেশি সময় লাগবে না। বেশি সময় লাগবে না গুদামে মজুদ মালগুলোর ব্যবস্থা করতে। কিন্তু গোলাপী, ওর কি করবে সে, সত্যি! ওর কথা ভাবলে মালেক মিয়ার দু'চোখ ভরে উঠে পানিতে। ঘুম আসছে না তার চোখে।

হঠাৎ একটা শব্দ মালেক মিয়ার কানে ভেসে এলো। কতকগুলো লোকের পদশব্দ, যেন তারা কোনো ভারী জিনিস বহন করে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো। মালেক মিয়া দ্রুত পিছন জানালাপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো

বাইরে। দেখতে পেলো চারজন লোক একটি বস্তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ইকরাম আলী লণ্ঠন হাতে তাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। মালেক মিয়া বুঝতে পারলো ইকরাম আলী তার চালগুলো নৌপথে কোথাও পাচার করছে।

মালেক মিয়া মুহূর্তে ভেবে নিলো কি করা যায়। যেমন করে হোক জানতে হবে তাকে এ চালগুলো কোথায় পাঠানো হচ্ছে।

মালেক মিয়া বেরিয়ে এলো বাইরে, চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো—মালিক, এরা কোথায় বস্তাগুলো নিয়ে যাচ্ছে?

ইকরাম আলী তখন ব্যস্ত ছিলো, মালেকের কথায় জবাব দিলো—তুই বুঝবি না।

তবে আমার হাতে লণ্ঠন দেন মালিক, আমি থাকতে আপনি এত কষ্ট করে...লণ্ঠন হাতে ওদের পথ দেখাবেন, তা হয় না। দিন মালিক, লণ্ঠন আমার হাতে দিন।

নে, আলো নিয়ে ওদের পথ দেখা। দেখিস, এ চালের কথা যেন কাউকে বলিস না।

না না, আমি তেমন লোক নই মালিক। নুন খাই আপনার, নেমকহারামি করতে পারবো না। আপনি হলেন কিনা গ্রামবাসীদের হিতৈষী বন্ধু......

মালেক মিয়া লণ্ঠন হাতে লোকদের চলার পথ দেখিয়ে দিতে থাকে। সন্ধ্যায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই পথঘাট পিচ্ছিল। লোকগুলো চালের ভারী বস্তা নিয়ে চলতে খুব অসুবিধা বোধ করছিলো, তবু ওরা পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

সমস্ত চাল বয়ে নিয়ে যেতে প্রায় রাত দুটো হয়ে আসে।

কখন যে মালেক মিয়া সরে পড়েছিলো কেউ খেয়াল করেনি।

নৌকার মহাজন যখন বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে টাকার গাদা গুণে দিচ্ছেলো ইকরাম আলীর হাতে, তখন হঠাৎ পিছনে পিস্তল হাতে জমকালো মূর্তি এসে দাঁড়ালো।

পিস্তলের দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠলো ইকরাম আলী ও নৌকার মহাজন। মহাজন সবেমাত্র টাকার গাদা ইকরাম আলীর হাতে দিতে যাচ্ছিলো, থেমে গেলো টাকা সহ তার হাতখানা।

ইকরাম আলী অস্ফুট কণ্ঠে বললো—তুমি, তুমি...আবার এসেছো.........

হাঁ, আমি এসেছি। ইকরাম আলী, তোমাকে সেদিন যা বলেছিলাম তা করোনি। আজ পুনরায় বলছি, যে চাল তুমি এইমাত্র নৌকায় পাঠালে ঐ চাল বিক্রি তুমি বন্ধ করে দাও নচেৎ তোমার মৃত্যু অনিবার্য। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ গ্রামবাসী যারা আজ সকালে তোমার কাছে টাকা নিয়ে চাল কিনবে বলে এসেছিলো তাদের ডেকে বিতরণ করে দাও......আর তুমি—ফিরে তাকায় বনহুর নৌকার মহাজনটির দিকে—চোরাকারবারী হিসেবে তোমাকেও আমি হত্যা করবো। যদি বাঁচতে চাও তবে তোমার অর্থ সব এই ইকরাম আলীর চাল বিতরণের সঙ্গে সবার হাতে হাতে তুলে দিয়ে খালি নৌকা নিয়ে চলে যাও। দাঁতে দাঁত পিষে কথাগুলো বললো ছায়ামূর্তি।

পিস্তলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কারও মুখে কোনো কথা সরলো না। ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তাদের মুখমণ্ডল। ঢোক গিলে বললো নৌকার মহাজন—আমি চাল কিনতে চাই না, আমাকে মাফ করে দাও।

মাফ। চোরাচালানী হিসেবে তোমাকে এই মুহূর্তে গুলী করে হত্যা করা দরকার কিন্তু করবো না যদি তুমি আমার কথামত কাল সকালে এই টাকা গরিব দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বিলিয়ে দাও.........

নিশ্চয়ই দেবো। জীবনে আর কোরোদিন চোরা ব্যবসা করবো না।

হাঁ, মনে রেখো, আমার নির্দেশ অমান্য করলে নিস্তার পাবে না। ইকরাম আলী......

আমি—আমিও শপথ করছি।

মনে রেখো কোনোরকম চাতুরি করেছো তাহলেই মরেছো। পিছু হটে বেরিয়ে যায় বনহুর। বেরিয়ে গিয়েই দরজায় শিকল টেনে বন্ধ করে দেয়।

কয়েক মিনিটের জন্য ওরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, তারপর নিজেদের সত্ত্বা ফিরে পায়, এবার তারা চিৎকার শুরু করে দেয়—কে কোথায় আছো ডাকাত পড়েছে...ডাকাত পড়েছে...মালেক, ওরে মালেক ছুটে আয়...ছুটে আয়......

চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন জেগে উঠলো, এমন কি আশেপাশের বাড়ি থেকে ছুটে এলো লোকজন, পাড়া প্রতিবেশী। সকলের হাতেই লাঠি-সোটা দা' কুড়াল। সবাই জানে, ক'দিন আগেই আকরাম আলীর বাড়িতে ডাকাত পড়েছিলো। সেদিন কিছু নিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি হয়তো তাই আজ আবার এসেছে। কেউ কেউ বল্লম নিয়ে ছুটে এলো।

ততক্ষণে একটা লাঠি হাতে মালেক মিয়াও এসে দাঁড়িয়েছে সবার সঙ্গে।

তখন দরজা খোলা হয়ে গেছে।

ইকরাম আলী ও নৌকার মহাজন বেরিয়ে এসেছে বাইরে, তারা হন্তদন্ত হয়ে ডাকাতের বর্ণনা দিচ্ছে।

ইকরাম আলী বলছে—ভাগ্যিস্ তোমরা ঠিক সময়মত এসে পড়েছিলে, নাহলে আজ কিছুতেই ডাকাত বেটা আমাদের ধনমাল টাকাকড়ি কিছু রেহাই দিয়ে যেতো না। তোমরা এসে পড়ায় ডাকাত কিছু না নিয়েই পালিয়েছে।

মহাজনকে দেখে গ্রামবাসীরা প্রথমে তাকেই ডাকাত মনে করে মারপিট করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু ইকরাম আলী বুঝিয়ে বললো, ইনি ডাকাত বা চোর বদমাইশ নন, ভদ্রলোক এসেছে কিছু চাল খরিদ করতে, তাই রাত হওয়ায় আমার বৈঠকখানায় বসেছিলেন। কথাবার্তা বলছিলেন আমার সঙ্গে, ঠিক ঐ সময় ডাকাত আসে......

সবাই শুনে বিশ্বাস করলো ইকরাম আলীর কথা। ডাকাত যে এসে মহাজনের টাকাপয়সা নিতে পারেনি, সেজন্য সবাই খুশি হলো এবং ডাকাতের উদ্দেশ্যে গালমন্দ করতে লাগলো।

ইকরাম আলী মালেককে ভীষণ গালাগালি করতে লাগলো-বেটা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলি, এদিকে ডাকাত এসে সবকিছু নিয়ে যাবার আয়োজন করেছিলো। কালকেই তোকে বলে দিয়েছিলাম লাঠি হাতে বাড়ির সদর দরজায় বসে থাকবি। শয়তান শুধু থালা থালা ভাত গিলতে পারিস্, না?

ইকরাম গৃহিনী তো ঝঙ্কার দিয়ে গালাগাল শুরু করে দিলেন। গভীর রাত্রির নিশ্চিদ্র অন্ধকার ভেদ করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়লো সেই কণ্ঠস্বর।

সবাই মিলে আক্রমণ করলো মালেক মিয়াকে। কেন সে রাত জেগে পাহারা না দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। ডাকাত যদি সব নিয়ে পালাতো তখন কি হতো! তাছাড়া মেহমান এসেছেন তাদের টাকা কড়ি যদি লুটে নিতো তাহলেই বা কি উপায় হতো—মান-সম্মান সব খোয়া যেতো......এমনি নানা ধরনের নানা কথার বিষবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলো সবাই মালেক মিয়াকে।

মালেক মিয়া নিশ্চুপ, মাথা নিচু করে সে দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে।